চিকিৎসা শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের'

প্ল্যাটফর্ম

উদ্বোধনী সংখ্যা ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ॥ পৃষ্ঠা ২৪ ॥ বিনিময় মূল্য ৩০টাকা

এই সংখ্যায়ঃ

চিকিৎসকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল চাই-১৮
কোয়াক হান্টার-১৯
শিক্ষকদের পাতা-২২

বলা হয় অক্ষর অবিনশ্বর। এই পত্রিকার পাতায় চিকিৎসক, হবু চিকিৎসক সবাই তাদের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, কৃতিত্ব, বেদনা, উল্লাসের কথা যেভাবে অক্ষরে বন্দী করেছেন তা সংরক্ষিত হয়ে থাকলো অনাগত কালের জন্য। চিকিৎসা পেশাকে আরো মানবিক করতে, এ পেশার মানুষদের পরস্পরের ভেতর বোঝাপড়া তৈরীতে এধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং প্রত্যাশা করি তা অব্যহত থাকবে।

শাহাদুজ্জামান, কথাসাহিত্যিক, চিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে।

স্বপ্নের ডাক্তার

রেজওয়ান শুভ,এজিএস ডিকিউএস,৩৯তম ব্যাচ, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

আজ থেকে তিন বছর আগের কথা। পরদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। বাসে চড়ে যাচ্ছিলাম। অবশ্য তখন আমি জাহাঙ্গীরনগরের চলতি শিক্ষাবর্ষের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র। আর একটু ভালো Subject এর আশায় ২য় বার ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। হঠাৎ কলেজের ছোট ভাই মেহেদীর ফোন। ফোনের রিসিভারটা ক্লিক করতে গিয়ে হাত ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল,ফোন কানে নিতেই মেহেদীর চিৎকার,

"ভাইয়া,আপনি মেডিকেলে চান্স পেয়েছেন! সলিমুল্লাহ মেডিকেল।"

নিজের কণ্ঠটার ভলিয়ম অনেক বেড়ে গেল,

"সত্যি বলছিস? আমি মেডিকেলে চান্স পেয়েছি!"

বাসের আশেপাশের সিটের মানুষ গুলো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি তখন আমার কাছের মানুষদের ফোন করে সুখবরটা দিতে শুরু করলাম। ততক্ষণে চলমান বাসের সবার কাছে আমি একজন নায়কের মত চরিত্রে পরিণত হয়েছি। এক বৃদ্ধ তাঁর বুড়িকে দেখিয়ে দিচ্ছে,"ঐযে, ঐ ছেলেটা, মেডিকেলে চান্স পেয়েছে, এই ছেলে তুমি মেডিকেলে চান্স পেয়েছো না? দোয়া করি ভালো ডাক্তার হও।"

তাঁর কথা শেষ না হতেই আমার সামনের সিটের এক দম্পতি আমাকে ডাকল।

দেখে মনে হচ্ছে, বছর দুয়েক আগে বিয়ে করেছে। বউটার কোলে ফুটফুটে একটা বাচ্চা।

আমাকে বলল, "বাবা আমার ছেলেটাকে একটু দোয়া করে দাও, সে যেন বড় হয়ে তোমার মত ডাক্তার হয়।"

বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

পাশের সিটের দুইজন কলেজ পড়ুয়া মেয়ে বলল,"ভাইয়া ভাইয়া,আপনি মেডিকেলে চান্স পেয়েছেন?"

তাদের ঠোঁটের কোণে অবাক হওয়া মিষ্টি হাসি দেখে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তাদের পেছনের সিট থেকে এক মধ্য বয়স্ক মহিলা তার কিশোর ছেলেকে বলে উঠল, "ঐযে দেখছ ভাইয়াটাকে, তোমাকেও কিন্তু ওর মত ডাক্তার হতে হবে। বাবা, আমার ছেলেকে একটু বলতো কিভাবে পড়তে হয়।"

আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম আরো অনেক উৎসুক মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একজন মায়ের চোখ জ্বলজ্বল করছে, একজন বাবার মুখে গর্বের ছাঁয়া, যেন আমিই তার ছেলে, দুইজন কিশোরী মেয়ের চঞ্চল খুনসুটি, বাসের হেলপারের অদ্ভুত শ্রদ্ধা।হঠাৎ বাড়ি থেকে মায়ের ফোন,"বাবা তুই বাড়ি আয়,জাহাঙ্গীরনগর আর গিয়ে কি করবি?"মাকে বুঝালাম,"যাচ্ছিলাম যখন যাই, বন্ধুদের সাথে দেখা করে আসি।"

অনেক স্মরণীয় একটি বাস ভ্রমন শেষে বাস থেকে নেমে আসতে খুব কষ্ট লাগছিল। কারণ ঐটুকু সময়ে বাসের সবাই আমার খুব আপনজনে পরিণত হয়েছিল। এক দাদু বাস থেকে নামার আগে আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে দিল, এক মা তার ব্যাগ থেকে অনেকগুলো চকলেট বের করে দিল। একজন বাবা আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কি যে আনন্দের ছিল সেই সময়টুকু তা হয়ত বোঝাতে পারবো না লিখে। যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালাম,তখন গিয়ে দেখি কিভাবে যেন আমার বন্ধুরা আগেই খবর পেয়ে গেছে। তাদের আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল তারা সবাই যেন আমার নিজের ভাইবোন,বন্ধুদের মধ্যে যে এত আনন্দ তা আগে কখনো অনুভব করিনি আমি। যে ছেলেটির সাথে আগে কখনো কথা হয়নি আমার, সে এসে বলল,

"চল দোস্ত, আজ সারারাত আড্ডা হবে।"বন্ধুদের সাথে একটা জমপেশ আড্ডা হল সেদিন রাতে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের আরো যারা চান্স পেয়েছিল মেডিকেলে তাদেরও অনেকে উপস্থিত হল তার পরদিন। দুদিন অন্যরকম একটি মুহূর্ত কাটিয়ে,নিজের কাগজপত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম! মা বাবা তো ততক্ষণে বাড়ি আয়, বাড়ি আয়, বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে।

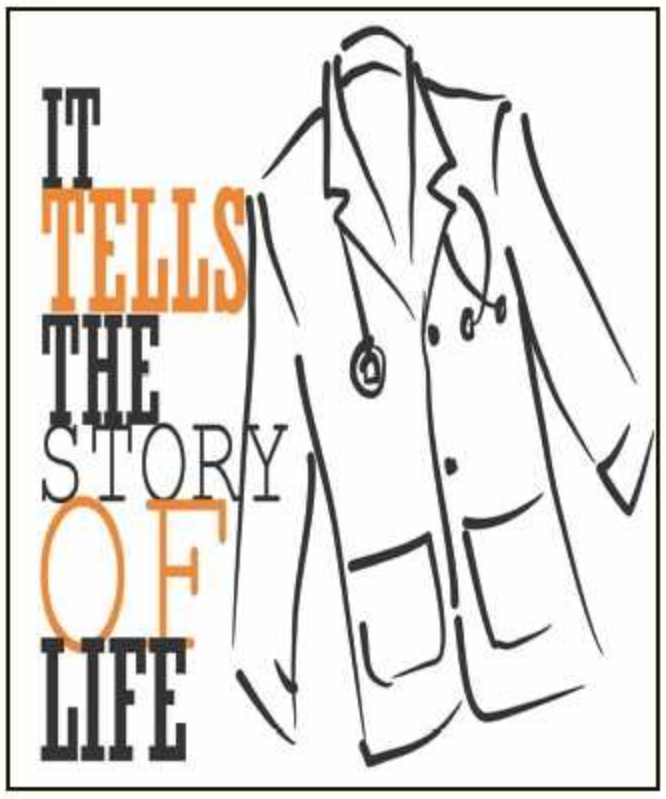

বাড়ি গিয়ে যখন মায়ের সাথে প্রথম দেখা হল তখন মায়ের মুখের এক চিলতে হাসি দেখে মনটা ভরে গেল। লেবু আর করমচার পাতায় শেষ বিকেলের সূর্য যখন একটু মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে দেয়, তখন তার একটুখানি ঝিলিক যেমন স্বর্ণের হাসির মত লাল-সাদা করমচা আর সবুজ লেবুর কচি সবুজ পাতায় জ্বলজ্বল করে জ্বলে, ঠিক তেমনই মায়ের সেই হাসিটুকু ছিল আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়া! আর তখনই বাবার কথা

-তোমার জন্য একটা টুকটুকে ডাক্তার বউ এনে দেব! কি অদ্ভুত! ডাক্তার না হতেই বাবার মাথায় তার ছেলের জন্য টুকটুকে ডাক্তার বউয়ের চিন্তা।যদিও বাবার কথাটা শুনে মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলাম। সব কথার ভীড়ে যে কথাটি কখনো বলা হয়নি তা আজ বলে গেলাম, মেডিকেলে চান্স পাওয়ার পর মায়ের সেই হাসির কথা। বাবার সেই টুকটুকে ডাক্তার বউয়ের কথা। বাসের মধ্যে সেই সুন্দর স্মৃতির কথা।

আর গ্রামের সেই বৃদ্ধটি যে কিনা গ্রামে গেলেই আমাকে ডাক্তার নাতি বলে

ডাকে,তার কথা। সেই সব মানুষদের শ্রদ্ধার কথা মনে করে মেডিকেলের সব কষ্ট,সবার কসাই ডাক,আর বিত্তবানদের অবজ্ঞা ভুলে গিয়ে বুক উচিঁয়ে বলতে চাই...

I am a medical student
A proud medical student

একটি ছেলে এপ্রনের আত্মকাহিনী

ওমর ফারুক,৫১তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি

চকবাজারের এমএস টেইলার্সে এক সন্ধ্যায় বসে বসে ঝিমোচ্ছিলাম। দুই নম্বর সুতির কাপড় বলে গুদামে পড়ে ছিলাম এক বছর। মেডিকেলে ভর্তি হল ছেলেদের পাল। ফাহাদ এলো, নাসিরাবাদ, মেডিকেল হোস্টেল থেকে। টেইলারের সাথে কথা বলল। কম দামে, কম সময়ে , সাদামাটা একটা এপ্রনের অর্ডার দিতে হবে, এডভান্স নাই। তাড়াহুড়ো করে কয়েক গজ সাদা কাপড় কিনে ফাহাদের শরীরের মাপ নিল টেইলার। ইমার্জেন্সি ডেলিভারি দিতে হবে বলে টেইলার সেলাই করার সময় ডান পাশের পকেটটা দুর্বলভাবে সেলাই করে এবং উপরের বোতামের চার ছিদ্রের মাঝে দুই ছিদ্র দিয়ে কোনমতে সুতা চালিয়ে দেয়।

টেইলার তার দোকানের নাম-ঠিকানা ছাপানো একটি কাগজের প্যাকেটে জন্মক্রটি নিয়ে আমাকে ফাহাদের হাতে ডেলিভারি দেয়। চকবাজার থেকে টেম্পুতে চড়ে নাসিরাবাদ পর্যন্ত আসে ফাহাদ। নতুন রুমমেট ফাহিমের সাথে দেখা হল টেম্পু থেকে নেমে। হাড় কাঁপুনি শীতে ঠাণ্ডা লেগেছিল ফাহিমের। ফাহাদের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে আমার উদ্বোধন করল গলায় পেঁচিয়ে, 'আমার মাফলার নাই, বাড়ি থেকে আনতে ভুলে গেছি'। ওড়নার মতো করে মাথার হুড আর গলার মাফলার, দুই ফর্মুলা এক করে শীতের সুরক্ষায় আমার এমন টেকনিক্যাল ব্যবহার করলো যে, ফাহিমের গলা থেকে বারবার প্যাঁচ খুলে বেরিয়ে আসতে চেয়ে ছিলাম, পারিনি। সারারাত কাশেমের নাকডাকা, গলাডাকা শুনতে শুনতে আমার কী যে অসহ্য লাগছিলো, ইচ্ছে করছিল গলাটা ভালভাবে টিপে দিই। ফাহাদের ছাতা নেই, কখনো ছিল বলে মনেও হয় না, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে আমিই তার একমাত্র ভরসা। বৃষ্টি আমার খুব প্রিয় । ফাহাদ না হলে সে সুযোগটা কখনো হত কিনা কে জানে। ফাহিম সাথে দেখা করতে কয়ে কজন বন্ধু রুমে এলো। কয়েক মাস হল ক্লাসের, সবাই অটোতে যেতে চায়, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমারও অটোতে যেতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কোথায় যাব, কার সাথে থাকব। এখানেতো কিছু একই রঙের বন্ধু আছে। রুমে এলে, মেডিকেলে এলে বন্ধুদের সাথে দেখা হয়। এসব যখন ভাবছিলাম ঠিক তখন আমার হাতার ভেতরে দিয়ে একটা তেলাপোকা তিরতির করে চলে যায়। আমার যা কাতুকুতু লেগেছিল না! কয়েকদিনের মাথায় কোন রকম সতর্ক বার্তা না দিয়ে হঠাৎ করে সবাই অটোতে চলে গেল। বদ্ধ ঘরে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। আমার গায়ে ছত্রাক বাসা বাঁধল, বিশেষ করে বগলের তলায়। এক প্যাকেট সার্ফ এক্সেল, দুই লিটার জল এবং দুইটি কিটোকোনাজল ট্যাবলেট মিশিয়ে একদিন ভিজিয়ে রাখল আমাকে। পরদিন বাতাসে সামান্য পঁচা গন্ধ ছড়া ছিলাম বলেই হয় তো আমার কথা ফাহাদের মনে পড়ল। ধুয়ে রোদে শুকাতে দেয়। সারারাত কুয়াশায় ভিজে ভিজে জীবনানন্দের কবিতা জপছিলাম তখন, ফাহাদ এসে টান দিল। আড়মোড়া করে ব্যাগে ঢুকিয়ে হালকা ভেজা আমাকে নিয়ে দৌড় দিল,'এই রিকশা, দাঁড়াও। মামা, কুইক, মমতাজ আফার ক্লাস শুরু হয়া গেছে'।

আমারও এক বন্ধু আছে, যদিও সে একটু ভাবুক টাইপের। 'ন' আদ্যক্ষরে তার মালিকের নাম। ভাবুক বন্ধু আমার হ্যাঙ্গারে ঝুলে দুলতে দুলতে সারাক্ষণ কী যেন ভাবে আর ভাবে। আমি খাটে শুয়ে , চেয়ারে বসে ফাহাদের প্যান্ট, শার্টের সাথে আড্ডা দিতে দিতে ওর কথা ভাবি, বেচারার কপাল ভালো, মালিক তার খুব যত্ন নেয়। কাপড় ধোয়ার নির্দিষ্ট ব্রাশে সামান্য ধুলিবালি পড়া চেহারা এতো ঝকঝকে করে দেয় যে মনে হয় মিনা ফেসিয়াল করে এইমাত্র রাস্তায় নামল। উল্লেখ্য, মিনার সাথে ফাহাদের ইটিশপিটিশ হয়। এ পৃথিবীতে এ কথা আমি আর ওরা দুইজন ছাড়া আর কেউ জানে না।

প্রফের ভাইভা ঘনিয়ে এলে প্রতিবছর আমাদের এক মহাসমাবেশ হয়। লন্ড্রিতে জমজমাট রিসেপশন শেষে আমরা ব্যাডমিন্টন কোর্টের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে মতবিনিময় করি। সারা বছরের কথা চলতে থাকে। রোদের তেজের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে আমাদের গালগপ্প। বিকেলের দিকে আমরা সবাই ফুয়েল ফুরিয়ে যখন ডিহাইড্রেটেড তখন লন্ড্রির দাদু এসে আমাদের কান ধরে টান দেন। দাদুর হাতে, ঘাড়ে চড়ে চলে আসি ফের লন্ড্রিতে। উষ্ণ বিদায় নিয়ে আমরা লন্ড্রির তাকে ঝিমুতে থাকি, কখন ফাহাদ বা ফাহিমরা রশিদ দেখিয়ে মালিকানা প্রমাণ করে আমাদের ছাড়িয়ে নেবে।

ঘোষণা

"প্ল্যাটফর্ম" ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। এর নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য আমরা মেডিকেল-ডেন্টাল শিক্ষার্থী,শিক্ষক,চিকিৎসক এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। দেশের প্রতিটি সরকারী বেসরকারী মেডিকেল-ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা ও পেশা বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করা হবে। যারা পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী তাদেরকে প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে যোগাযোগের জন্য আহবান করা হলো। পত্রিকার উন্নতিকল্পে লেখক পাঠকের গঠনমূলক মতামত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে।

চিকিৎসক কেবল একটি পেশা নয়, এটি একটি স্বতন্ত্র জীবনধারা। সমাজের অংশ হয়েও চিকিৎসকেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন যাপন করেন। চিকিৎসা শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের "প্ল্যাটফর্ম" পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যার প্রতিটি লেখায় পেশাগত জীবনের নানা দিক ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন সর্বস্তরের চিকিৎসকেরা । মেডিকেল কলেজে চান্স পাবার উচ্ছ্বাস থেকে শুরু করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যু সংবাদের শোকাহত হবার সর্বজনীন অনুভূতি সময়ের দলিল হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে "প্ল্যাটফর্ম" পত্রিকায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "প্ল্যাটফর্ম" গ্রুপে ব্যস্ত অধ্যাপক থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পোস্ট থেকে লেখা বাছাই এবং সর্বসাধারণের জন্য উপযোগী করে তুলতে হয়েছে চিকিৎসদের সর্বপ্রথম পত্রিকার জন্য। পেশাগত ঈর্ষণীয় সাফল্য থাকলেও গোষ্ঠী হিসেবে চিকিৎসকেরা অনেক পিছিয়ে, একতাবোধ থাকলেও পড়াশোনা,কর্ম ব্যস্ততার কারণে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। "প্ল্যাটফর্ম" পত্রিকা চিকিৎসা শিক্ষা ও পেশা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ,ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর পাশাপাশি চিকিৎসক সমাজের একতাবোধ দৃঢ় করতে কাজ করবে । প্ল্যাটফর্ম পত্রিকায় লেখক ব্যক্তি হিসেবে বক্তব্যের জন্য দায়ী থাকবেন না, সাধারণ চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের ভাষ্য হিসেবে পত্রিকার লেখাগুলোকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে । গল্প,নিবন্ধের সকল চরিত্র কাল্পনিক।

সম্পাদক// ডাঃ মোহিব নীরব
উপদেষ্টা সম্পাদক// ডাঃ সানজিদা সাহরিয়া
শিল্প সম্পাদক//ডাঃ শাকিল সালেকিন

সম্পাদনা পরিষদ//
ডাঃ সাকিব আল নাহিয়ান
ডাঃ ইনকগনিটো
ডাঃ সেলিম শাহেদ
ডাঃ অনুজ কান্তি দাশ
ডাঃ জুবায়ের মাহমুদ খান
ডাঃ মারুফুর রহমান আপু

সজ্জা //
ডাঃ শাহেদ সাখাওয়াত হোসেন
ডাঃ এনামুল হোসেন ইমন

যোগাযোগ
সিফাত খন্দকার
ফাতিমা ফারিহা আনিকা
আহমেদুল হক কিরণ
মেহেদী শাহরিয়ার রীহান

অর্থযোগ
আদনান বিন আখতার
ডাঃ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ
মোঃ আসিফ উদ্দিন খান

প্রচার ও প্রকাশনা
আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ
অনুরাজ বিশ্বাস অভীক
ডাঃ ইয়াসির আরাফাত হিমু
শরিফ মারিয়া রহমান
ইশরাত জাহান মৌরি

যোগাযোগের ঠিকানা
১৫, বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ০১৬৭০৯৭৪২৫৩,০১৯১১০৫৬১৭৭, ০১৬৭৪৯৩০৫৩০
ওয়েবঃ www.platform-med.org
ইমেইল:bddoctorsplatform@gmail.com
ফেসবুক পেজ:www.facebook.com/pages/
প্ল্যাটফর্ম/237592689724934
ফেসবুক গ্রুপ:www.facebook.com/groups/platform.bd/

মূদমূদ্রণ: খন্দকার কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং
১১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ০১৭১৪২৪৪৯৬৬

শাঁখের করাত,মেডিকেলের বরাত

মোঃ নাহিদুজ্জামান তালুকদার,৪০তম ব্যাচ, রংপুর এমসি

মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছ, কদিন' পর ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। এখন যে সময় আর আনন্দের মাঝ দিয়ে যাচ্ছ সবাই, সেটার কিরকম নাটকীয় পরিবর্তন হতে পারে ক্লাস শুরু হবার পর তার ছোট্ট একটা নমুনা দিলাম মাত্র।

মেডিকেলে ক্লাস শুরু হবার আগের তিনমাসঃ
০১. অনুভূতিঃ আহ! পাইছি আমি, মেডিকেলে চান্স পাইছি!!
০২. মানসিক অবস্থাঃ মনে অশেষ প্রশান্তি তবুও ঘুম হয়না ক্লাস শুরুর অপেক্ষায় ।
০৩. খাবার রুচিঃ মিষ্টান্নের এবং মুখরোচক খাবারের প্রতি আগ্রহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিলক্ষিত ০৪. Bones এবং বই কেনার পরঃ Bones দেখে আর বই উল্টায়। কিছু বুঝে না কিন্তু বলে - Oh nice!! What is this?
০৫. পড়াশোনার প্রতি আগ্রহঃ পড়াশোনার আগ্রহ তুঙ্গে, কিন্তু কোনটা পড়তে হবে বুঝে না তাই Netter এর Atlas of Anatomy। এর পাতা উল্টিয়ে সময় কাটে

মেডিকেলের ক্লাস শুরু হবার পরের তিনমাসঃ
০১. অনুভূতিঃ উহ! উহ! খাইছি ধরা, এইবার গেছি আমি।
০২. মানসিক অবস্থাঃ মনে প্রবল অশান্তি তবুও ঘুমের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্তভাবে বেশি
০৩. খাবার রুচিঃ মুখে কোন খাবার রুচে না আইটেম আর কার্ডের চিন্তায়, তবে মনে মনে Rat killer কিংবা এ ধরণের পণ্যের বিক্রেতার খোঁজাখুঁজি চলে।
০৪. Bones এবং বই কেনার পরঃ Bones দেখে, বই পড়ে, এখানেও কিছু বুঝে না। তাই হতাশ হয়ে বলে-"What the hell is this?"
০৫.পড়াশোনার প্রতি আগ্রহঃ Gray's Anatomy আর Datta এর বই পড়ে মাথা হ্যাং পড়াশোনার আগ্রহ শুন্য।।

মেডিকেলীয় বাঁশবাগান

ডাঃ সরদার মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন,৩৩তম বিসিএস,৪৬তম ব্যাচ,চট্টগ্রাম এমসি

মেডিকেলে সুযোগ পেয়ে ভেবেছিলাম,
পেয়ে গেছি সোনার ডিম পাড়া হাঁস।
অল্প পরেই ভাঙল ভুল, তাকিয়ে দেখি একি!
চারিদিকে কেবল বাঁশ আর বাঁশ।
প্রথম দিনে, এনাটমির ক্লাসে দেখি ওমা!
টেবিলে একটা মস্ত বড় লাশ।
ফরমালিনের ঝাঁঝালো গন্ধে,
আমার আটকে আসছিল যে শ্বাস ।
গাইটনের আকার দেখে,
হতাম আমি উদাস।
আকাশ পাতাল ভাবি বসে।
কি করে করব আমি পাশ?
কম. মেডের সংজ্ঞা দেখে,
ইচ্ছে হতো গলায় পড়ি ফাঁস,
ভাইভা বোর্ডে বসে আমার
বুদ্ধি হতো নাশ ।

মেডিকেলীয় উপদেশ নামা

প্রথম পর্বঃ এসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ তৌহিদুল আলমের উপদেশ নামা

"আপনারা সবাই বেকুব, আপনাদের প্রিন্সিপাল ও বেকুব"-তৌহিদ স্যারের প্রথম ডায়ালগ লেকচার গ্যালারীতে। হ্যাঁ বায়োকেমিস্ট্রির ডাঃ এএসএম তৌহিদুল আলম (এমবিবিএস এমসিপিএস এমডি এমআরসিপি পিএইচডি), যার নামের শেষে সবগুলো ডিগ্রী টার্মের ভাইভায় মুখস্ত না বলতে পারলে ফেল নিশ্চিত। এবং অবশ্যই পরীক্ষার হলে বেকুব লাগলেই ফেল। স্যারের লেকচারের একটা খাতা ছিলো ভাইভার সময় সাথে নিয়ে যেতে হতো । সেই খাতার শুরুতে স্যারের কিছু উক্তি লিখতে হতো। অনেক দিন পর স্যারের সেই খাতাটা হাতে পেয়ে বেকুব হয়ে গেলাম। স্যারের উক্তির কিছু নমুনা প্ল্যাটফর্মের পাঠকদের জন্য–
১ প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি ডাক্তার হবো কিনা?
২ ডাক্তারি একটি কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী পড়াশোনা। এ পেশায় অনেক ধৈর্য ও অধ্যবসায় প্রয়োজন।
৩ শুধুমাত্র এমবিবিএস ডাক্তার হওয়ার জন্য ডাক্তারি পড়া নিষেধ।
৪ জীবন একটি সূক্ষ্ম অংকের হিসাব নিকাশের খাতা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে এর মাশুল দিতেহবে। জীবন একবার বাঁকা পথে গেলে আর সহজ পথে আসা যায় না।
৫ পড়াশোনার মাধ্যমে তৌহিদ স্যারের কাছে পাশ করা যাবে না। পরীক্ষা পাশের উপায় হচ্ছে ডাক্তারি সুলভ ব্যবহার, ড্রেসআপ, নিয়মানুবর্তিতা,সততা এবং সামান্য পরিমাণ বৈষয়িক জ্ঞান।
৬ লেখাপড়া একটি আর্ট।
৭ জীবনে উন্নতি করতে গেলে প্রয়োজন সততা এবং বুদ্ধিমত্তা।
৮ এই পেশায় থাকতে হলে মানবতাবোধ থাকতে হবে, যে ডাক্তার যত মানবতাবাদী , সে তত ভালো জানে।
৯ তৌহিদ স্যারের কাছে কখনো মিথ্যা বলা যাবেনা।
10 A Person Who Is Not Talented Should Not Be Allowed
১১ ডাক্তারি পাশের জন্য প্রফেশনাল ব্যবহার অনেক জরুরি।
১২ ব্যবহার, ড্রেসিংয়ে এ স্মার্টনেস থাকতে হবে। একটু বেকুব মনে হলেই ফেল।
১৩ নিয়মিত ক্লাস করলে এবং পড়লে কোনদিনই ফেল হবে না। পাশ করার এটাই সহজ পথ।

১৪ জীবন একটা প্রতিযোগিতা। জীবনে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকতে হবে।
১৫ জীবনে হতাশা বলে কিছু নেই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে।
১৬ জীবনে শুদ্ধ হওয়াটা বড় কঠিন, কিন্তু শুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
১৭ লেখাপড়া না করলে এমবিবিএসই শেষ ডিগ্রী।
১৮ পরীক্ষায় ফেল করলে কখনোই প্রতিবাদ করা যাবে না।
১৯ প্রতিটা মানুষের জীবনে একটা আদর্শ থাকতে হবে। আদর্শ ছাড়া মানুষ চলতে পারেনা।
২০ পড়াশোনা এবং ডাক্তারির কোন ক্ষেত্রে তৌহিদ স্যারকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।
২১ এই মেডিকেলে অনেকগুলো গলি। একটি ছাড়া বাকিগুলো খারাপ।
২২ জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান নিজেকে করতে হবে।
২৩ মেডিকেলে ভর্তি হবার পর একটা কাজই করতে হবে শুদ্ধ ভাবে ডাক্তারি শিখতে হবে।
২৪ মেডিকেল কলেজে পড়ে কেউ ডাক্তার হবার জন্যে আসেনা ।
২৫ সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে জ্ঞান নিয়ে মেডিকেলে ঢুকেছিলাম সেই জ্ঞান নিয়েই
বেড়িয়ে যাবো। মাঝে শুধু ৫/৬বছর ।
২৬ ধর্মীয়ভাবে এবং সামাজিকভাবে এই ডাক্তারি পেশার সমকক্ষ কোন পেশা নেই ।
২৭ পড়াশোনার অনেক রকম আছে, পরীক্ষা পাশের পড়া, ভালো ডাক্তার হবার জন্য পড়া , সময় কাটানোর জন্য পড়া।
২৮ মেডিকেলের শিক্ষকরা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক না ইহাদের পোছপাছ আলাদা ।
২৯ আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে যেন তৌহিদ স্যারের মেধার ১০০ ভাগের ১ ভাগ তিনি আমাদের দেন!
৩০ নিজের অজ্ঞতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে, নিজেকে নিজের আত্মসমালোচনা করতে জানতে হবে ।
৩১ যে কোন মানুষের সাথে প্রথম পরিচয়ে মনে করবেন সে একটা চোর ।
৩২ যার যত লেবাস সে তত ভন্ড ।

স্বভাবতই ফাঁকিবাজ আমি সবগুলো উপদেশ লিখিনি। এখন এত বছর পরে বুঝতে পাড়ি স্যারের কিছু কথাকতটা সত্য। তৌহিদ স্যার প্যানক্রিয়াসের বিটা সেল থেকে আসা এমাইলিন হরমোন আবিষ্কারকদের একজন। স্যারকে শ্রদ্ধা জানাতে এই পোস্ট এবং ফার্স্ট ইয়ারের বাচ্চে লোক অফ দা রেকর্ড লেকচার খাতায় লিখে নিতে পারো।

ডাঃ মোঃ মহিবুর হোসেন নীরব, এমডি রেসিডেন্ট
(অনকোলজি) বিএসএমএমইউ,৪৮তম ব্যাচ,চট্টগ্রাম এমসি

দ্বিতীয় পর্বঃ মানবদেহের সরলাংক

1st phase এর subject গুলির মধ্য Anatomy এক অথৈ সাগরের নাম যার কোন কুল কিনারা নাই। এর জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডারে physio আর bio এর জন্য মোট যে সময় রাখা হয়েছে এক anatomy এর জন্য তার বেশি সময় রাখা হয়েছে। 1st phase এর আদালতে anatomy হল eye witness আর physio+bio হল lab evidence. এনাটমি তে যা চোখে দেখা যাচ্ছে তাই পড়ানো হয়, তা সত্ত্বেও বেশীরভাগ স্টুডেন্ট না বুঝে মুখস্ত করার চেষ্টা করে। যার ফলশ্রুতিতে তার অবস্থা হয় রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনের মত,"পড়েছে বিস্তর,জেনেছে অল্প"। সঠিক ভাবে এনাটমি জানার জন্য Grays anatomy,Snell, Datta এর বিকল্প নেই কিন্তু বেশির ভাগ স্টুডেন্ট বাইপাস হিসেবে গাইড বইয়ের দিকে ঝুঁকে। তাদের এই শর্টকাট রাস্তা প্রফের টেবিলে শর্টসার্কিট হয়ে ধরা পরে।

প্রয়োজনীয় গাইডলাইন আর অপ্রয়োজনীয় বাইপাসের কারণে অনেক স্টুডেন্ট দিকভ্রস্ট হয়ে পরে,তাই বইয়ের virtual দুনিয়া থেকে স্টুডেন্টদের visual দুনিয়ার সাথে পরিচয় করানোর দায়িত্ব প্রফেসর আর লেকচারারদের। প্রফেসর আর লেকচারারদের গাইডেন্সের পাশাপাশি প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে আমার এ লেখাঃ

Anatomy শব্দের মানে I Cut up/cut open , এনাটমি কে মুলত ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে ১) gross anatomy আর ২) histology(basic microscopic) এছাড়াও রয়েছে embryology (special & general), ভাইভাতে আরো কিছু ভাগ রয়েছে যেমন hard part,soft part,Dissection,surface anatomy,Radiology,OSPE. Anatomy শুধু পড়লেই হবেনা সাথে draw করাও শিখতে হবে। এনাটমি গুছিয়ে পড়তে হবে যেমনঃ ভিসেরা (viscera) ; যেসব বিষয়ে ধারণা রাখতে হবে তা হল, প্রথমত, ভিসেরার ভৌগোলিক অবস্থান তথা anatomical position। দ্বিতীয়ত,আশেপাশের viscera,vessel, এর সাথে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক তথা relation, তৃতীয়ত,blood vessel এর অর্থনীতি তথা ভিসেরা কে কোন vessel কতটুকু supply দেয়। এছাড়াও ভিসেরার histology তথা কোন basic tissue থেকে উৎপত্তি, microscopic special charachter, কী ? embryological development কোথা থেকে হচ্ছে type ও funtion জানতে হবে।

Vessel (artery & vein): মানব শরীরে ভেসেল (vessel) হল রাস্তা তথা রোড যার GPS প্রতিটা স্টুডেন্ট এর নখোদর্পে থাকা চাই, কোন ভেসেল এর এর উৎপত্তি (origin) কোথায় ?
শেষ (continuation) কোথায়? শাখা (branch) কি ? যেমনঃ হার্ট থেকে arch of aorta'র মাধ্যমে blood হাতে (upper limb), head,neck,brain এ কিভাবে যায়?

Bones: পড়তে যে সব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তা হল, bones এর type, bones এর parts (typical আর section করা bones) , কি কি joint তৈরি করে, type of ossification, relation with vessel,nerve muscle attachment

Embrayology: কোন week এ কি কি change হয় তার পুরো details। সাথে সকল প্রকার derivatives পড়তে হবে।

histology: একটি মেডিকেলীয় চারুকলা সম্পর্কিত জ্ঞান,এখানে রয়েছে স্লাইড চেনা, ফোকাস করা, সেই সংগে ছবি আঁকা, তবে ছবি আঁকার জন্য যে তাকে ভিঞ্চি কিংবা পিকাসো হতে হবে তা নয়। স্লাইড চেনা হল প্রাক্টিস আর কিছুটা চতুরতার মিশ্রন, microscope এর নীচে আর বাইরে দুই ভাবেই স্লাইড চিনে রাখতে হবে। microscope এর সঠিক ব্যবহার জানতে হবে, histologyর identification point জানতে হবে,সাথে এর রিলেটেড পড়া পড়তে হবে ।

এনাটমি সঠিকভাবে রপ্ত করতে হলে,মুখস্ত করার বৃথা চেষ্টা বাদ দিয়ে,bones viscera হাতে ধরে, দেখে,বুঝে পড়তে হবে,নইলে প্রফের টেবিলে অবস্থা হবে,"দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া" "শিখতে হলে দেখতে হবে' এটাই হোক এনাটমির মূলব্রত । "What Mind Does Not Know Eyes Can Not See"

ডাঃ ইসমেত আলো,৩২তম বিসিএস(সিরাজদীখান উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মুন্সিগঞ্জ)১২তম ব্যাচ, জেডএইচ শিকদার ওমেন্স এমসি

তৃতীয় পর্বঃ ঘুম ভাঙ্গুক আর নাই ভাঙ্গুক,সকালে লেকচার

সে সব হবু ডাক্তারদের জন্য এই পোস্ট,যারা এখনো 'ফিটাস', 'নতুন মুরগি','ফিশ' বিভিন্ন নামে ক্যাম্পাসে ঢুকেছেন এবং যারা এখনো প্রফ গুলোর পুল সিরাত পার হননি তাদের জন্য একজন চির ফাঁকিবাজ 'সংগ্রামী নতুন ডাক্তার'(struggling new doctor!!) এর উদাত্ত পরামর্শ ! মেডিকেল লাইফে নির্বিঘ্নে পাস করার একমাত্র অব্যর্থ টোটকাঃ

'লেকচার ক্লাসে রেগুলার থাকুন!
লেকচার ক্লাসে রেগুলার থাকুন!'
... সারারাত ফোনে বিএফ/জিএফ এর সাথে ঝগড়া করসেন?
... তবু লেকচার ক্লাসে আসুন!
...সারারাত আড্ডা দিসেন,টিউটোরিয়াল আইটেমের পড়াহয় নাই?
... তবু লেকচার ক্লাসে আসুন!
... সকালে ঘুম ভাঙ্গে না, ঘুমাতে ভালো বাসেন?
... লেকচার ক্লাসে এসে হলেও ঘুমান!
... নিজেকে আঁতেল ভাবতে জাস্ট হেইট করেন? আতলামি Sucksssss ...?
... তবুও লেকচার ক্লাসে আসুন!
... খাতা বই নাই, কোন ক্লাস সেটাও জানেন না?
... তবুও লেকচার ক্লাসে আসুন!

এবার যেহেতু এসেই পরেছেন, তাই লেকচার গ্যালারীর একটা উমদা সিট ধরে বসে পড়ুন। উমদা মাতলাব, unique!! সেখানেই আপনি সব সময় বসেন! মোটামুটি ৮০% সময় একই বেঞ্চ এর একই সিট!! এবার, আঁতেল হলে টেক্সট বই বের করে লেকচার মিলাতে থাকুন, সেমি- আঁতেল হলে খাতা বের করে লেকচার উঠান, পোয়া আঁতেল হলে লেকচার বুঝার ট্রাই করুন, ফাঁকিবাজ হলে একটা 'খুব বুঝতেসি' ভাব ধরে থাকুন,বেশী ফাঁকিবাজ হলে জাস্ট সোজা হয়ে বসে থাকুন, মারাত্মক ফাঁকিবাজ হলে চোখ মেলে ঘুমানোর অভ্যাস করুন ...তবু লেকচার ক্লাসে আসুন!

আপনাকে যে স্যার/ ম্যাডাম ক্লাসে দেখতে দেখতে চেহারা চিনে ফেলবেন, তিনি প্রফ ভাইভাতে থাকলেন! হয় external, নয় internal, নয় বেল বাদক, নয় কিছুই না। হয়ত রুমের পাশে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়,'ওহ, ভাইভা হচ্ছে নাকি!" বলতে বলতে এসে ঢুকলেন। তিনি নাম্বার দেন, না দেন,বিশ্বাস করেন, উনি চোখ বন্ধ করেই আপনি কোন সিটে বসে ক্লাস করতেন সেটাও বলে দিতে পারবেন। আপনি উত্তর পারলে বলবেন, ক্লাস করেছো বলেই পেরেছে! না পারলে বলবে, ক্লাস করেছো পারলে না কেন? যাই বলুক! লাভ একমাত্র আপনার। কারণ -

১) আপনার টেনে টুনে হলেও পাস নিশ্চিত!
২) একটু মুখ খুললেই ভালো মার্কস!
৩) মহাভারত অশুদ্ধ না করে ফেলা পর্যন্ত 'ফেল ইজ ইম্পসিবল!'

মনে রাখবেন, মেডিক্যালে কেবল ৫% পাবলিকের সম্ভাবনা নিজ গুণে পাস করা । বাকি ৯৫% এর গোপাল হচ্ছে কপাল! result পাবার পর, ক্যান ফেল করসেন সেটাও বুঝবেন না/ক্যামনে পাস করসেন সেটাও বুঝবেন না/কিসের লাইগা অনার্স দিল সেটাও বুঝবেন না! এই ৯৫% কপাল 'যদি এবং কেবল যদি' পরীক্ষকের উপর নির্ভরশীল থাকে,যদি এই কথাটা আমার বিশ্বাস করে থাকেন, যদি অল্প কষ্টে বেশী লাভ চান,যদি কষ্ট করেও ফল নিশ্চিত চান, যদি কষ্ট না করেও ভালো ফল চান... তবে...তবে...তবে... লেকচার ক্লাসে আসুন ! লেকচার ক্লাস করতে বলি নি! টেক্সট বই পড়তে বলি নি! লাইবেরি ওয়ার্ক করতে বলি নি! দিন রাত পড়তে বলি নি ! শুধু একটাই কথা বলেছি...
যদি আরামসে পাস করতে চান, লেকচার ক্লাসে আসুন, একটা ইউনিক সিট এ বসুন এবং চেহারাটা চেনান !

বকবক শেষ! লম্বা কথার জন্য গুস্তাখি মাফ!!
ফর্মুলা এতই সোজা, ভাবতাম কাকে যে জানাই! এখানে জানালাম, যদি একজনেরও কাজ হয়, আপুর জন্য দোয়া না করলে খবর আছে কিন্তু!!

ডাঃ তাহসিনা আফরিন,৩৩তম বিসিএস ফরেন সার্ভিস ক্যাডার (রিকমেন্ডেড),এমডি পার্ট টু রেডিয়েশন অনকোলজি,এনআইসিআরএইচ,৪৬তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি।

ফিরে দেখা ২১ তম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক

সাকিব মাহমুদ, ৩৮তম ব্যাচ, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

শুরুটা এক বছর আগে ছোট্ট একটা চিঠির মাধ্যমে। আমন্ত্রণ পত্র। ২১তম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পত্র। আমাদের কলেজের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ডাঃ দিলীপ কুমার ধর স্যার আমন্ত্রণপত্র পাওয়া মাত্র বিতার্কিক অনুসন্ধানের জন্য অডিশনের ডাক দিলেন। বিতর্কের জন্য স্যারের মতো এত পাগল মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। বলা বাহুল্য স্যার কে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। সে যাই হোক অডিশনের খবরটা পেলাম ইন্টারনেটে। কারণ, আমি তখন দেশের বাড়িতে আরামে পিঠা পায়েস খাচ্ছি। খবর পাওয়া মাত্র আমার মাথায় ছোটখাট একটা বাজ পড়ল। এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে? হাত ছাড়া হয়েই যেত যদি না সেদিন আমাকে না বলে অডিশন লিস্টে সবার শেষে ছোট করে স্বপ্নীল দা (স্বপ্নীল সৌরভ রায়) আমার নামটা লিখে না দিতেন।
অডিশন হল, সিলেকশন হল। দলের কাঠামো দাঁড়াল কিছুটা এরকম - ১ম বক্তা-শাহিদা আফরিন, ২য় বক্তা- স্বপ্নীল সৌরভ রায়, ও ৩য় বক্তা আমি নিজে। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী বরিশাল মেডিকেল কলেজ। আমরা ভালোই বলেছিলাম, কিন্তু অল্পের জন্য হেরে গেলাম। (বিতর্ক হারার পর সব বিতার্কিকেরই মনে হয় 'ভালোই বলেছিলাম, বিচারক জিতালেও পারত')
ভেবেছিলাম আমার বিতর্কের রঙিন(!!) ক্যারিয়ার বোধহয় এখানেই শেষ। কিন্তু বেশ কিছু দিন পর বিটিভি থেকে সুখবর এল প্রথম রাউন্ডে বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য আমরা দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছি। আনন্দের আতিসাজ্জে এবারের প্রস্তুতি হল আরো সাদামাটা। পরীক্ষার কারণে দল থেকে ছুটে গেল শাহিদা। তার জায়গা নিল ক্যাম্পাসের নাট্যকার হিসেবে পরিচিত 'রেজওয়ান শুভ'(এটা তার সাহিত্যিক নাম। আসল নাম এ,এইচ,এম রেজওয়ান) প্রতিপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীম উদ্দিন হল। বিতর্কের বিষয়ে পল্লীসাহিত্য থাকায় আমরা তিন জনই পাঞ্জাবি পরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার পরিকল্পনা করলাম। কিন্তু বিধিবাম, ঘটল উল্টো ঘটনা। অবাক তো কেউ হলই না। বরং বিরক্ত হয়ে বিচারক আল-মামুন স্যার এক হাত নিয়েই নিলেন। ফলাফল অনুমেয়,আবার পরাজয়। তাই বলে কেউ আবার পাঞ্জাবীকে দোষারোপ করবেন না। এ বিতর্কে আমারা খুব একটা সুবিধা করতে পারিনি।

যাই হোক বিতর্কের ক্যারিয়ারের ইতি টেনে, পুরোনো ট্রফিগুলো ঝেড়ে মুছে সুবোধ বালকের মত যখন ক্লাস আর ওয়ার্ডে ব্যস্ত। তখন আবার সুখবর, না এটা মহা সুখবর। আমরা আবার বেস্ট লুজার। (বেস্ট লুজারের বিশ্ব রেকর্ডটা কি তা আমার জানা নেই)।
নক আউট পর্ব। প্রতিপক্ষ সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রুপ পর্বেই জিততে পারলাম না, নক আউট পর্বে তো প্রশ্নই ওঠে না। তবে এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা বলে প্রিন্সিপাল স্যার ঘোষণা দিলেন এবার শক্ত প্রস্তুতি নিতে হবে।

ব্যাস, প্রিন্সিপাল স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ শাখাওয়াত স্যার, ডাঃ সুদীপ স্যার, ডাঃ ইফাত আরা ম্যাডাম, ডাঃ নাজনীন ম্যাডাম, ডাঃ রঞ্জিত স্যার, ডাঃ হুমায়ারা ম্যাডাম, ডাঃ সানিয়া ম্যাডাম, ডাঃ জালাল স্যারেরা প্রায় এক প্রকার ধরে বেঁধে আমাদের তৈরি করলেন মহারণকে সামনে রেখে। ফলাফল, প্রথমবারের মত জয়ের স্বাদ। আমাদের আর পায় কে। আনন্দের আতিসাজ্জে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে একটা ব্লেজার চেয়ে বসলাম। আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি রাজিও হয়ে গেলেন।
এবার ব্লেজার কেনার পালা। ব্লেজার হতে হবে এক রঙের। আমি আর সাদমান সামান্য স্বাস্থ্যবান বলে আমাদের ব্লেজার আগে কেনা হল। (আমাদের মোটা বলিয়া লজ্জা দিবেন না, আমারা স্বাস্থ্য সচেতন)। ব্লেজারের সাথে এক রঙা টাই না কিনলে হয়? সেটাও কেনা হল। ওহ, সাদমানের পরিচয়টাই তো দেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য জনিত কারণে স্বপ্নীলদা দল থেকে ছিটকে পড়ায় তার স্থলাভিষিক্ত হয় ১ম বর্ষের তাহসিন মাহমুদ সাদমান।
সেমি ফাইনাল
প্রতিপক্ষ আবার সেই কবি জসীম উদ্দিন হল। নতুন ব্লেজার পড়ে আমরা সবাই রেডি। কিন্তু ঝামেলা বাধল অন্য জায়গায়। আনন্দে আনন্দে টাই তো কিনলাম, কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? মানে আমারা কেউ ই টাই বাধতে পারি না। তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না টাইপের একটা বকা দিয়ে নিজ হাতে আমাদের টাই বেধে দিলেন ডাঃ ইফফাত আরা ম্যাডাম ও ডাঃ নাজনীন ম্যাডাম। ব্লেজার আর টাইয়ের জোড়েই কিনা অত্যন্ত শ্বাসরুদ্ধকর এক বিতর্কের শেষে আমরাই জয়ী হলাম।
এবার আনন্দ নয় প্রত্যাশা টের পেলাম, এবার ফাইনালে ওঠার তৃপ্তি নয়, বিজয় কেতন ছিনিয়ে নেবার তৃষ্ণা টের পেলাম, প্রথমবারের মত। পৃথিবীটা গোল তাই বুঝি বার বার দেখা হয়। ফাইনালে কাকতালীয় না হয় নিয়তির ফেরে আবার মুখোমুখি স্যার সলিমুল্লাহ আর বরিশাল মেডিকেল কলেজ। টেলিভিশন বিতর্কের ইতিহাসে প্রথম 'অল মেডিকেল ফাইনাল'। আর তাই কোমরে গামছা বেঁধে (এপ্রোন বেঁধেও বলাযেতে পারে) প্রস্তুতি নিলাম।
বিতর্কে কি হয়েছে মনে নেই। কি যুক্তি দিয়েছি, কি যুক্তি খণ্ডন করেছি মনে নেই।
শুধু বিতর্ক শেষে সভাপতি সুলতানা কামাল ম্যাডাম বিজয়ী দলের নাম স্যার..... বলামাত্র গ্যালারী থেকে ভেসে আসা আনন্দ চিৎকার মনে আছে। সাদমান আর শুভ'র আনন্দে জড়িয়ে ধরা মনে আছে। চোখের কোনে একবিন্দু অশ্রুর উপস্থিতি মনে আছে। আমরা জিতে গেলাম। ২১ তম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক জিতে গেলাম। কিন্তু শুধুই কি বিতর্ক জিতলাম? প্রিন্সিপাল স্যার যখন আমাদের তিনজনকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন ' তোমরা আমার স্বপ্ন পূরণ করেছো'। সেটাই বা কোন ট্রফির চেয়ে কম কিসের? কিংবা চ্যাম্পিয়ন ঘোষনার পর ডাঃ সুদীপ স্যারের সেই চিৎকার কি আমাদের অর্জন নয়? অথবা টাই বাধতে গিয়ে ডাঃ ইফফাত আরা ম্যাডাম বলেছিলেনঃ 'টাইও বাধতে পারো না এখন দেখি টাই তোমাদের জন্য টাই বাঁধতে পারে এমন মেয়েও খুঁজতে হবে'। এমন স্নেহ ভালোবাসা বিতর্কের জন্যই তো পেয়েছি। শুধু শিক্ষক নয় মনে থাকবে ফাইনালের পর স্বপ্নীলদা'র 'আমরা জিতেছি' বলে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরা। মনে থাকবে সিনিয়র হিসেবে মিনহাজ ভাই আর সাবরি ভাইয়ের পরামর্শ। মনে থাকবে জুনিয়রদের ' ভাইয়া বিতর্ক তো জিতলেন এবার খাওয়ান' জাতীয় আবদার (৪১ তম ব্যাচ, তোমাদের নাম আলাদা আলাদা করে বলব না। কারণ পঙ্গপালে সবার আলাদা আলাদা নাম থাকে না,তোমরা সবাই স্পেশাল)।
আমরা শুধু শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ স্যারের হাত থেকে ২১ তম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কের ট্রফিটাই জিতিনি। জিতেছি আরো অনেক কিছু। তাই তো আবার নতুন কোন আমন্ত্রণ পত্রের অপেক্ষায় বসে আছি। কথায় আছে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আর বিতার্কিক মনে হয় ঘুমের মাঝেও কথা বলে।

রম্য রচনা

একপায়ে নুপূর

ফাইরুজ ইসলাম দ্বীপি,১৯তম ব্যাচ, মেডিকেল কলেজ ফর ওমেন

একহাতে গাইটন তোমার,
অন্যহাত খালি।
একপাশে নোটের স্তুপ,
অন্যপাশে বালিশ।
আমার রিডিং পার্টনার বলো,
পড়বে কি?

বলবো না, আমাকে সব পড়িয়ে দিতে হবে ,
বলবো না আমি সব পড়েছি।
শুধু জিজ্ঞেস করি ,
দেবে কি পাড়ি,
হোক যত সাপ্লি।

আমার রিডিং পার্টনার বলো ,
আজ পড়তে বসবো কি ?

লুঙ্গি বিলাস

দুঃখ বিলাস (পিন্টু),৫২তম ব্যাচ,রাজশাহী এমসি

আমাদের স্যার-ম্যাডামগণ Anatomy, Physiology, Biochemistry সহ আরও অনেক Lecture দিয়ে থাকেন। তাঁরা যদি 'লুঙ্গি' এর উপর Lecture দিতেন তাহলে বিষয়টা কি রকম হত?

ম্যাডামঃ 'লুঙ্গি' is a Fibro-serous covering গিট্টুড between two iliac spine and further insertion is unknown. 'লুঙ্গি' তিন প্রকার- ১) চেক লুঙ্গি, ২)একরঙ্গা লুঙ্গি , ৩) প্রিন্টেড লুঙ্গি এটা vivar জন্য important একটা কুয়েসচেন (question)। আর একটা কথা লুঙ্গির অবশ্যই স্লাইড থাকবে। Microscope এর নিচে চিনতে হবে যে এটা সুতি লুঙ্গি, না গুলিস্তান মিক্সড লুঙ্গি, না বার্মিজ মেয়েদের লুঙ্গি। এটা তোমরা জাঙ্কুইরা থেকে দেখে নিবে। এবার আস Histology তে। লুঙ্গির Lining Epithelium.
সাধারণ লুঙ্গির outer and inner দুই surfaceই Keratinized stratified squamous epithelium. কিন্তু প্রিন্টেড লুঙ্গির inner surface Non-Keratinized cillieted columner epithelium. লুঙ্গির দুইটা opening Lower opening এ বড় gap junction থাকে which provide us a large air sinus. আর প্যান্টের ক্ষেত্রে থাকে Tight Junction. এটা written এ অনেক সময় থাকে; ভাইভাতেও আমরা ধরি।
এবার দেখো লুঙ্গির Development. লুঙ্গির এক সাইডে একটা Ridge থাকে যেটা সুতা দিয়ে সেলাই করা থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, Embryonic Period এ লুঙ্গি একটি থান কাপড় ছিল। সাধারণত লুঙ্গি কেনার Within 1or2 hours এটা সেলাই করা হয়। এছাড়াও আরও important কুয়েসচেন (question) আছে। "এই 3rd বেঞ্চের ডান দিক থেকে ৩ নম্বর ছেলেটা দাঁড়াও। তোমার কাছে important মনে হয় এমন কয়েকটা কুয়েসচেন বলোতো। যেমনঃ Draw and Label লুঙ্গি,লুঙ্গির 1st week of Development, 3rd week of Development, লুঙ্গির সিঙ্গেল সেলাই,ডাবল সেলাই etc । এটা Langman এ ভাল দেয়া আছে।

স্যারঃ Good Morning .তোমরা সবাই কেমন আছো। আজকে তোমাদের Movement পড়াব। লুঙ্গির কি কি Movement আছে? এই দেখ, এটা যদি ১টা লুঙ্গি হয় (using Blackboard) তাহলে এটা হবে (Stage এর উপর নাচ শুরু) লুঙ্গির Flexion আর এটা হবে Extension.এটা Abduction আর এটা Adduction. এ রকম আরও আছে। যেমনঃ লুঙ্গির Medial Rotation, Lateral rotation, Circumduction etc। তোমাদের জন্য এটুকুই important. আর post Graduation এর জন্য আরও আছে। যেমনঃ মালকোচ্চা movement , Sleeping time involuntary movement etc। আর একটা জিনিস খুবই important তা হল Factors giving Stability to পরিধানকৃত লুঙ্গি। লুঙ্গির গিট্টু is the main factor এছাড়াও surrounding muscles and fat.। তোমাদেরকে এটা অনেক Practice করতে হবে। Practice makes a "লুঙ্গি পরিধান" perfect.। সাথে Clinical importance টা অবশ্যই পড়বে। যেমনঃ ১) লুঙ্গি provides wider space long time after circumcision 2) Any ছিঁড়া in লুঙ্গি continues Gradually Lengthening & widening until further সেলাই। এই একজন উঠে আস,Roll call কর ।

ম্যাডাম:গতদিন তোমাদের কি পড়ানো হয়েছিল? Roll Number 01 দাঁড়াও। Roll Number ২,৩,৪ তারপর ,তারপর, পিছনের বেঞ্চ। দাঁড়াও, বারবার ১কথা বলতে হয় কেন? পড়াশুনার তো কোন দরকার নাই। খালি আস আর যাও না? আর পরীক্ষার সময় গাইড তো আছেই। আজকের topic লুঙ্গি। নাও তোল (using Projector)। হইছে? তোমাদের hand writting এত Slow কেন? লেখ... লেখ...
(students: ছাইড়া দে মা...) চলতেই থাকবে...

স্যারঃ Dear ইসটুডেন্ট , লুঙ্গি is very important for our life. হেঁ হেঁ হেঁ (হাসি) মানে natural life. It is very very কি? হেঁ হেঁ হেঁ কমফুরটেবল। লুঙ্গি is our নেশোনাল ডেরেস (national dress)। each and এভরিবডি should হেঁ হেঁ হেঁ Wear কি? লুঙ্গি। No লুঙ্গি No পাস। বুঝছো তুমরা? I say "If you Do not Wear লুঙ্গি , I Shall Not Pass" হেঁ হেঁ হেঁ । (students: হেঁ হেঁ হেঁ হা হা হা হি হি হি) ও mistake mistake "you'll not pass". তুমাদের লেপটোপ আছে না লেপটোপ? ওতে মুডেম লাগায় নিবা । আর internet এ দেখবা বিদেশের লুঙ্গির কত বাহার। বিদেশে লুঙ্গির অনেক দাম। হেঁ হেঁ হেঁ । তুমরা পারলে লুঙ্গির সাথে internet connection নিবা। আপাতত সবাই লুঙ্গি কিনে ফ্যালাও। তবে অবশ্যই মেইন কপি কিনবা।

ফুটোকপি লুঙ্গি Not allowed. হেঁ হেঁ হেঁ ফুটোকপি বুঝো তো? যে লুঙ্গিতে ফুটো থাকে হেঁ হেঁ হেঁ। লুঙ্গি পড়ে তুমরা মার্সিডিসে চড়বা হেঁ হেঁ হেঁ। তুমরা লুঙ্গি পড়লে অনেক income করবা। লুঙ্গি ফর Earning। লুঙ্গির ভিতর শার্ট ইন করে পড়বা, বেল্ট লাগাবা হেঁ হেঁ হেঁ। সবার ব্যাচ থেকে গুরুপভিত্তিক লুঙ্গি আনবা আর Department এ জমা দিবা। তুমরা সবাই ১০ টাকা করে দাও। Lab এর জন্য লুঙ্গি কিনে রাখা হবে। ইসটুডেনটরা আসবে আর লুঙ্গি পরে দেখবে হেঁ হেঁ হেঁ। এই ইসটুডেনট কি বুঝলা দাঁড়াও [নিদ্রাজনিত কারণে সম্পূর্ণ Lecture তোলা সম্ভব হয় নি বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত]

সাপ্লি

সাপ্লি রোমন্থন

নিলয় শর্মা শুভ,২১তম ব্যাচ,ফরিদপুর এমসি

সারাদিন হাসপাতাল আর চেম্বারে থেকে ক্লান্ত হয়ে বাসায় আসলাম। গাড়ি থেকে বড় আলিসান বাড়িটার গেটে নামতেই সাইনবোর্ডটা প্রতিবার চোখে পড়ে। ডাঃ নিলয়, তার নিচে এমবিবিএস, এফসিপিএস সহ আরও কিছু ডিগ্রির নাম লেখা! আয়নার সামনে দাঁড়ালে পাকা চুলগুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আজ আমি অনেক বড় ডাক্তার। হেঁটে হেঁটে আমার ছেলের রুমের দিকে গেলাম। সে এবার একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার জীবনের লক্ষ্য সে নিজেই বেছে নিয়েছে। জানি না কি জন্য সে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে, হয়ত বাবার এই ব্যস্ত জীবনটাতে আর্কষণীয় কিছু খুঁজে পেয়েছে!

টেবিলটাতে মোটা মোটা বই গুলো সাজানো, তার সামনের চেয়ারে গোমড়া মুখে বসে আছে আমার ভবিষ্যত ডাক্তার ছেলেটি।
"কি বাবা, মন খারাপ কেন?"
আমার দিকে একবার চেয়ে আবার চুপচাপ বসে রইল। একটু পরই শান্ত গলায় উত্তর দিল,
"থোরাক্স কার্ডে সাপ্লিমেন্টারী দিতে হবে। আজকে রেজাল্ট দিলো।"
কি বলবো বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ করেই পুরোনো কিছু স্মৃতি উঁকি মেরে গেলো! থোরাক্স নামক এনাটমির এই পরীক্ষাতে আমিও সাপ্লি দিয়েছিলাম। এটাই ছিল মেডিকেলে প্রথম পরীক্ষা যার মাধ্যমে সাপ্লির সাথে আমার পরিচয়। তিনবার সাপ্লি দেয়ার পর পাশ করতে না পেরে আমার হতাশ হয়ে পড়া সেই দিনগুলো চোখের সামনে এখনও ভাসে। থোরাক্সে পাশ করতে না পারায় প্রফের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া,সবই আজ অতীত!
জীবনে অনেক যুদ্ধের পরে আজ আমার এই অবস্থানে এসে সেই পুরাতন কথা চিন্তা করা মানায় না।
নীরবতা ভেঙে শান্ত গলায় বললাম, শোন, তুমি আজ যে পথে আসছো সেখানে এরকম অনেক হবে। এই লাইফটাই এরকম, যেখানে হতাশার মুল্য নেই। চেষ্টা করে যেতে হবে, পড়াশোনায় জীবনের সাথেই লেগে থাকতে হবে। পড়ো, চেষ্টা করো...
স্টুডেন্ট লাইফের সেই স্মৃতিগুলো সাথে নিয়ে ছেলের রুম থেকে বের হয়ে আসলাম। অনবরত টেলিফোনটা বেজে চলছে, হয়ত আবার কোন পেসেন্টের ফোন.....

পাস মার্ক

জয় সরওয়ার,৪৭ তম ব্যাচ,ময়মনসিংহ এমসি

- বাবা কি A+ পাইছো?
- জ্বী না আন্টি!
- তাইলে কি, প্লেস করছো? বোর্ডে স্ট্যান্ড করছো?
- জ্বী না আন্টি!
- তাহলে? স্টার মার্ক পাইছো?
- ঠিক তাও না আন্টি!
- ও আচ্ছা, শুধু পাস করছো?
- জ্বী আন্টি!
- ওওওও ....

আন্টির "ওওওও" দীর্ঘশ্বাস শুনে রাহাতের মনেও চাপা দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়। কেমন যেন করুণার দৃষ্টিতে আন্টি রাহাতের দিকে তাকায়। সে দৃষ্টি যেন বলতে চাইছে-"আহারে! ছেলেটা আগে কত ভালো স্টুডেন্ট ছিলো! A+ পাইতো, ক্লাসে সবসময় প্লেস করত, আত্মীয় স্বজন সবাইকে রেজাল্টের মিষ্টি খাওয়াইতো, দোয়া চাইতে আসতো! আর এখন!? "রাহাতের এক বন্ধুকেও একবার এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়ে ছিলো। বুয়েটের স্বনামধন্য বাঘা স্টুডেন্ট সে! আন্টি জানতে চাইলেন, "রেজাল্ট কি বাবা?"
বন্ধু তো বত্রিশ দাঁত কেলিয়ে-বুকের পাঠা কিঞ্চিত ফুলিয়ে বিশাআআল ভাব নিয়ে বলল,
"আন্টি! ৪.০ পাইছি!!"
আন্টি হতাশ হয়ে বললেন,"ও আচ্ছা! এইবার A+ পাও নাই!?"
সেরা রেজাল্ট করেও এমন অপদস্ত হওয়া রাহাতের বন্ধুরা সেরাম পঁচানি দিয়ে ছিলো ওকে। কিন্তু রাহাতের অবস্থা তো আরো করুণ!
আন্টি হয় তো ভাবছেন, ৩৩ নম্বর পেয়ে পাস করে এতো খুশি এতো লাফালাফির কি আছে? রাহাত ভাবে, আন্টিকে তো আর আগ বাড়িয়ে বলা যায় না, মেডিকেলে পাস মানেই ফার্স্ট ক্লাস মার্ক- ১০০ মধ্যে ৬০!! তাও আবার প্রতি বিষয়ের লিখিত, ভাইভা এবং প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষায় আলাদা আলাদা ভাবে। ক্লিনিক্যাল বা প্র্যাক্টিকালের দৌড ঝাঁপ কিংবা ম্যারাথন ইভেন্টগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম। লিখিত পরীক্ষায় ৬০ পাইতে হলে পরীক্ষার আগের দিন কোন কোন প্রফে দেড় বছরের পড়া, আবার কোন প্রফে দুই বছরের পড়া রিভাইজ দেয়া লাগে!! আর প্রতি বিষয়ে দুইখান ভাইভা বোর্ড নামক টর্চার সেল তো আছেই। ভাইভায় পাস করার জন্য প্রফেসরদের পা ধরাটাই বুঝি বাকি থাকে। রাহাত অবশ্য একবার ভেবেছিল, বের হওয়ার সময় স্যারদের কে কদমবুসি করে আসবে কিনা! এই সুদীর্ঘ প্রায় আড়াই মাসের পরীক্ষা যুদ্ধ শেষেও যারা পাস নামক সোনার হরিণের দেখা পায় না, তাদের দীর্ঘশ্বাস যদি আন্টি শুনতে পেতেন! কিন্তু আন্টিকে এতো কিছু বুঝিয়ে লাভ নাই। বরং আন্টির করুণা মাখা চাহনির দিকে তাকিয়ে আন্টির হতাশা আরেকটু বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা জাগলো রাহাতের। বত্রিশ দাঁত বের করে বলল, "দোয়া করবেন আন্টি! পরের প্রফে যেন ফেল না করি! "আন্টি অনেক কষ্টে একখান শুকনো হাসি দিয়ে বলল,
"আচ্ছা বাবা!" আর মনে মনে হয় তো ভাবল,
"গেছে... ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে!!"

আন্টির কাষ্ঠ হাসি দেখে রাহাতের বড্ড মায়া হয়। আর মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
"কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কি সে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে!"

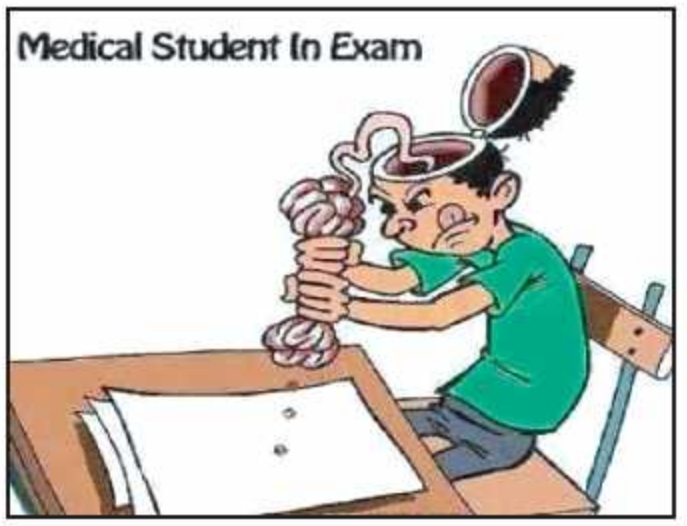

ভাইভা বিড়ম্বনা

হিমেল বিশ্বাস,৪৭তম ব্যাচ,ময়মনসিংহ এমসি

শুরু করার আগে আমার শ্রদ্ধেয় স্যারদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভাইভা দিতে গিয়ে বিড়ম্বনার শিকার হয়নি একথা বুক ফুলিয়ে বলার সাহস খুব কমজনেরই আছে। তেমনি কিছু তুলে ধরছিঃ
১/ ১০টা টপিকস এর উপর ভাইভা, গুরুত্বপূর্ণ সবগুলোই আপনার নখদর্পনে, যেটা বাদ দিবেন, স্যার ঠিক ঐটা থেকেই শুরু করবেন।
২/ একটা definition অনেক বড়, আপনি পড়লেন না, পড়লেন বাকিগুলো, মানে তার classification, description etc etc. স্যার আপনাকে definition টাই জিজ্ঞাসা করবেন এবং না পারলে ঐ classification বা description আপনাকে জীবনেও জিজ্ঞাসা করবেন না। কারণ যে definition ই পারে না, সে classification পারবে কিভাবে?
৩/ সবচেয়ে পেইন লাগবে তখন যখন স্যার বলবেন এসব কোথা থেকে পড়েছ? কারণ Davidson এর কথাও তাঁর পছন্দ হয় না। তাঁর নিজের উদ্ভাবিত definition ছাড়া তিনি কোনোটাকে definition ই মনে করেন না।
৪/ দুই একটা ভাল প্রশ্ন মিস করলে যখন এক্সটার্নাল স্যার ইন্টার্নাল স্যারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছেলে ক্লাস করে? ইন্টার্নাল স্যার বিনা বাঁধায় বলে দেন, "কখনো তো দেখিনি ক্লাসে"। ঘরের শত্রু বিভীষণ।
৫/আপনি ভাল পারছেন, স্যার হঠাৎ নিজের কাছে খুব কঠিন মনে হওয়া একটা প্রশ্ন করলেন, আপনি সুন্দর করে উত্তর দিলেন। কি ভাবছেন? স্যার খুশি হয়েছেন ? না হন নাই। তবে সব স্যার এমন নয়।
৬/ উত্তর দিতে পারছেন না বলে স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, লেকচার কর? আপনি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। স্যার পার্সেন্টেজ খাতা চেক করলেন, ঠিকই তো, করোই তো, তাহলে পারছ না কেন? স্যারের সাথে কেমনে বলবেন,"লেকচারে শুধু উপস্থিত থাকি, করি না"।
৭/ পারছেন না বলে স্যার বললেন, কিছুই তো পড়ে আসোনি। কিন্তু নিজেই চিন্তা করে দেখেন, প্রফের মত পরীক্ষা কেউ না পড়ে দিতে যায়? আপনি তো চারবার FCPS এ পাশ করতে পারেন নাই, না পড়েই গেছিলেন পরীক্ষা দিতে?

৮/ সবচেয়ে পেইনফুল আরেকটা ব্যাপার হলো, স্যারদেরকে মুখ চেনানো। লেকচার, টিউটোরিয়াল, ওয়ার্ড, স্যার এর নিজের রুম ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় কারণে অকারণে বিনা কারণে স্যারের পিছনে যদি আঠার মতো লেগে থাকা যায়, ঢং করা যায়, তাহলে স্যার কেন, ঐ ডিপার্মেন্ট এর আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই চিনে যাবে। চোখ কান তো সবাই খোলা রেখেই চলে,তাই না? ওরাই আবার সুযোগ পেলেই বলে বসে "স্যাররা কি মুখ দেখে পাস করায়?"

A+ Teacher মনসুর খলিল স্যার

ডাঃ আমেনা বেগম ছোটন,৪১তম ব্যাচ,সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি।

এম.বি.বি.এস. প্রথম বর্ষ। মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিলাম অতি শখ করে, ২য় বারের প্রচেষ্টায়। মাঝারি গোছের একজন ছাত্রীর কাছে প্রায় চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার। কিন্তু প্রথম কয়েকমাসেই হাড়ে হাড়ে টের পেলাম স্বপ্নভঙ্গ কাকে বলে, কত প্রকার ও কি কি? বিদঘুটে ভিসেরা, তার চেয়েও বিদঘুটে পড়ার পদ্ধতি। স্যাররা ঠিক কি শুনতে পেলে খুশি হবেন, সেই জটিল রহস্যভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আইটেমে লাগাতার পেন্ডিং খেতে খেতে আত্মবিশ্বাস নেমে গেছে মাইনাস লেভেলে। মাথায় বদ্ধমূল ধারণা চেপে বসেছে আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। ডেইলি রুটিনে পড়া কম, কান্নাকাটি বেশি চলছে। দেখতে দেখতে thorax card final চলে এল, রিটেন শেষ। এবার ভাইভা বোর্ড। দু একজন বাদে সবারই কাঁদো কাঁদো চেহারা। আমার পালার জন্যে অপেক্ষা করছি, যেমন ফাঁসির আসামি অপেক্ষা করে ফাঁসির জন্যে। দূর থেকে ভাইভা বোর্ডে নিজের ক্লাসমেটদের ভাইভা দেখতে পাচ্ছি, কি ভয়ঙ্কর! ডাক চলে এল, রোল ৬২। হতাশ ভঙ্গিতে গিয়ে ভাইভা বোর্ডে বসলাম। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই হেরে বসে আছি। ভাবছি, আজ কতটুকু অপমানিত হবো। ওই পাশে যিনি বসে ছিলেন, তিনি এক পলক দেখেই সব আঁচ করে ফেললেন , তারপর কি করলেন?

উনি জানতেন, আমাকে মুখস্ত কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পারব না। বললেন, বাপু হার্টের ভিসেরা ধরো। আমার সাধ্য ছিল, সেটা এনাটমিকাল পজিসনে ধরা। সেভাবে ধরে বসে রইলাম। উনি আমাকে ছোট খাট কিছু প্রশ্ন করলেন, বাইকাস্পিড ভাল্‌ভ কোনটা, এই টা কি? ওইটার কাজ কি ? উত্তর দিতে এত ভাল লাগছিল, অন্তত আমার মুখ দিয়ে কিছু বের হচ্ছে আমি এতেই খুশি। লাংস থেকেও কিছু সহজ প্রশ্ন করলেন। আমি মহা আনন্দে জবাব দিতে লাগলাম। ভাইভা বোর্ডে একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া থেকে আনন্দদায়ক আর কিছু হতে পারে না। ভাইভা শেষ হল, আমার মাঝে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবার আনন্দ। কিন্তু শুধু আমাকে পাশ করিয়ে দেয়া স্যারের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি একজন সফল মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি খুব ভাল করে জানেন, সরকারি মেডিকেলে চান্স পাওয়া দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কেন পরীক্ষার সময় এমন মানসিক প্রতিবন্ধীর মতো আচরণ করতে থাকে, মেডিকেলের পড়া তাদের জন্য কিভাবে সহজপাচ্য করা যায়। জিজ্ঞেস করলেন, বাপু তোমার রুমমেট কয় জন, আমি বললাম, ২২ জন (কমন রুম!) তোমার সাথে কেউ পড়ে না? আমি চরম ইমোশনাল হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম। কোন রকমে বললাম, 'জি না স্যার'। স্যার বললেন, 'ওদেরকে বলবে, তোমার সাথে পড়তে, একা পড়বে না, তাহলে সব ভুলে যাবে। কান্নাকাটি করবে না'। স্যার হয়ত আরও কিছু বলেছিলেন, আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্যে, আমার মনে নেই শুধু মনে আছে, এক চরম দুঃসময়ে আমার সাথে একজনের দেখা হয়েছিল। আমি অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, তিনি ঠেকিয়েছিলেন। তিনি কে অনুমান করতে পারছেন? দি গ্রেট মনসুর খলিল স্যার। উনি এনাটমিকে সহজ বোধ্য করেছিলেন। গ্রে'স এনাটমি নামক ভারত্তোলন যন্ত্রের হাত থেকে আমাদের রেহাই দিয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশি দিন উনাকে শিক্ষক হিসাবে পাই নি, তাহলে হয়ত আরও কিছু শিখতে পারতাম। এ কথা সবাই জানে, উনি ভয়াবহ মেধাবী একজন মানুষ। উনি কেন এনাটমি সাবজেক্ট বেছে নিয়েছিলেন , জানি না। তবে এতে অনেক ফার্স্ট প্রফ ছাত্রছাত্রীর জীবন বেঁচে গেছে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

বিচিত্র কারণে অনেক স্যারই উনাকে সহ্য করতে পারতেন না। মূল অভিযোগ ছিল, উনি সবাইকে পাশ মার্ক (বহু অনার্স সহ) দিয়ে মেধার সঠিক মূল্যায়ন করছেন না, মুড়ি মুড়কির একদর করে ফেলেছেন ইত্যাদি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব অভিযোগের বিপক্ষে, কারণ প্রথমত আমি মুড়ি মানে সাধারণ ছাত্রী, আমি আমার স্বল্প মেধা, ক্ষমতা নিয়ে পাশ করতে চাই।
দ্বিতীয়ত হাবিজাবি প্রশ্ন করে একজন ছাত্রকে ঘাবড়ে দিয়ে, তাকে ফেল করিয়ে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করার কোন যুক্তি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। আমি একজনকে প্রফে ফেল করালাম, ওই ছাত্রের কাছে আমি কি আশা করি? সে মহা উৎসাহে, অতি আগ্রহ সহকারে এনাটমির সব পড়া পড়ে ফেলবে? বরঞ্চ তার মধ্যে এনাটমির প্রতি একধরনের ভয়, বিতৃষ্ণা তৈরি হবে। আমি যদি তার শিক্ষক হই, সে সারাজীবন আমাকে ঘৃণা করবে। আর, তার জীবনে ৬ মাসের একটা বিভীষিকাময় সময় তৈরি হবে। এর দায়িত্ব কে নেবে? আমার মনে আছে এক সিনিয়র আপুর কথা, তার রুমমেট পাশ করে থার্ড ইয়ারে ওয়ার্ডে যাওয়া শুরু করেছে। তার সাথে ওয়ার্ডের নানা বিচিত্র ঘটনার গল্প করছে (দয়া করে কেউ এমন করবেন না, এইটা সহ্য করা মুস্কিল) সে চোখের পানি আটকে রুমের বাইরে গিয়ে কান্নাকাটি করছে, আমাদের টিচাররা কি জানেন এই সব কষ্টের কথা?

সম্ভবত মনসুর খলিল স্যার জানতেন। তাই অত কথা শুনেও আমাদের পাশ মার্ক দিতেন। আমরা সবাই জানি, মেডিকেলের পড়া খুব কঠিন। কথাটা আংশিক সত্য। চাইলেই সব কিছু সহজ করা যায়, ভাইভা বোর্ডে যমদূত না সেজে মনসুর খলিল স্যার হওয়া যায়, আমার মত কয়েকটা লাইন চ্যুত গাধাকে পথে আনা যায়। আমি তো আমার স্যারদের বলতে পারব না, স্যার আমাদের সাথে এমন করেন, এইটা বেয়াদবি। ভবিষ্যতে হয়ত, অনেকেই শিক্ষক হবে তাদের অনুরোধ করব, আমার মতো অনেক ছাত্রছাত্রী থাকবে,একটু খেয়াল রাখবেন। নতুন সিলেবাস, সম্পূর্ণ ইংরেজি ভাষা, বাড়ি ছেড়ে দূরে থাকা, এতগুলো চাপ নিয়ে আমাদের পক্ষে মানিয়ে নেয়া মুশকিল। আপনাদের একটু সহানুভূতি পেলে আমরাও পারব। না পড়ে পাশ মার্ক আমরা চাই না , কষ্ট করে যা পড়েছি, তা যদি একটু পরখ করে দেখেন, আমাদের পাশ মার্ক দিতে আপনার কষ্ট হবে না। মনসুর খলিল স্যার বার বার জন্মাবেন না । উনার মতো হওয়া হয়ত সম্ভবও না। তারপরও চেষ্টা করতে দোষ কি ? ছাত্ররা গভীর কৃতজ্ঞতায় আপনাদের সারাজীবন মনে রাখবে, এও কি কম প্রাপ্তি ?

ক্লিনিক্যাল ক্লার্ক

থার্ড ইয়ার

দুঃখ বিলাস (পিন্কু),৫২তম ব্যাচ, রাজশাহী এমসি ।

থার্ড ইয়ার হলো ওয়ার্ডে ভাব নিয়ে চলার ইয়ার। আনকোরা নতুন স্টেথো আর বিপি ঘাড়ে নিয়ে রুগীর লোকজনের স্যার স্যার শুনে বেড়ানো আর গম্ভীর মুখ নিয়ে এক্সরে বা আল্ট্রাসনোগ্রাম এর রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে থাকা। তারপর বলা, "মনে তো হচ্ছে সব ঠিকই আছে। বাকিটা বড় স্যার দেখে বলবেন ।"
হঠাৎ করে রেজিস্টার বা প্রফেসর স্যারের সামনে পড়লে মিনমিন করে বলা, " স্যার আমরা থার্ড ইয়ার।"

ব্যাস অমনি সাত খুন মাফ। কেউ কেউ আবার মহা উৎসাহী হয়ে উপস্থিত লেকচার শুরু করে দেন। পাক্কা দুই ঘন্টার ধাক্কা। দাঁড়ায় থাকতে থাকতে ঠ্যাঙের ভেরিকোস দশা। কেস হিস্ট্রি তো আরেক পেইন। আমরা যেসব তথ্য নেই তাকে হিস্ট্রি বলা যায় কিনা তা নিয়ে নিজেরই সন্দেহ আছে ।
" -আপনার পা কিভাবে ভাঙ্গল?
- রিকশা থেকে পড়ে ।
-ও আচ্ছা কতদিন যাবত রিকশায় চড়েন? আপনার পরিবারের আর কে কে রিকশায় চড়ে?"... ইত্যাদি ইত্যাদি।
আর, বিশেষজ্ঞ রোগীর পাল্লায় পড়লে তো কথাই নাই; কিংবা দুই তিন ব্যাচের কাছে ইজ্জত হারানো non co-operative হার্নিয়ার রোগী অথবা পূর্বে DRE এর শিকার কোনো রোগী। কেউ অসুস্থ হওয়ার দুই বছর আগের গল্প শুরু করে আর কারও পেটে হ্যামার মারলেও কথা বের হয় না। আমার নিজের সাথেই ঘটা :
-বাবা আপনার কি সমস্যা?
-লিভারের সমস্যা।
-না মানে,আপনার কি হয়েছিল?
- আমার লিভারে একটা ফোঁড়া হইছিলো।
- তাতে আপনার কি সমস্যা হইতো?
- বাবা তোমরা ছেলেপুলে মানুষ। বুঝবা না। এই রিপোর্টে সব লেখা আছে দেখো।

থার্ড ইয়ার শেষের সেই দিনগুলাই এখন মিস করি। প্রফেসর লেভেল থেকে শুরু হওয়া ঝাড়ির প্রান্তিক লেভেলে এখন আমরা। সবচেয়ে নিয়মিত স্টুডেন্টকেও যখন শোনা লাগে "পেশেন্টের গায়ে তো কোনোদিন হাত দেও নাই। কিভাবে পারবা? ওয়ার্ডেও তো আসোনা।" তখন আমার মতো ফাঁকিবাজ সোসাইটির সামনের দিনগুলা কেমনে কাটবে কে জানে ।

হিস্ট্রির মিস্ট্রি

আব্দুল্লাহ আব্দুল আজিজ,১৫তম ব্যাচ, নর্থ-ইস্ট এমসি

ওয়ার্ডে রোগীদের হিস্ট্রি নিতে গিয়ে সিলেটি ভাষায় অভ্যস্ত নয় এমন বন্ধু আর বান্ধবীরা হিমশিম খাচ্ছে।
এক রোগী আমাদের এক বন্ধুরে বলে,"ফড়ি গিয়া পিঠিত দুখ পাইছি (পড়ে গিয়ে পিঠে ব্যাথা পাইছি)"
বন্ধু আমারে এসে বলে দোস্ত পেশেন্ট বলছে, "পরী চলে যাওয়ায় সে হৃদয়ে অনেক আঘাত পাইছে।"
আমি মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম। হৃদয়জনিত বিষয়ের চিকিৎসাও আজকাল হাসপাতালে হয় তাহলে ?

আরেক রোগী আমাদের এক বান্ধবীকে বলল, "ফেটর গালাত বিশ খরে (পেটের সাইডে ব্যাথা করে)। লগে দাস্ত আর উতরঙ্গী"বান্ধবী বলল, "খালা দাস্ত বলতে কি বুঝাচ্ছেন" "আমি কইতাম কেনে ? তুমি ডাক্তর তুমি কও। দাস্ত কিতা আমিই যদি তোমারে বুঝাই তাইলে তুমি কিতার ডাক্তর? আমিই বড় ডাক্তর।"

নেপালীরা এখনো ওয়ার্ড করেনি। ঈদের ছুটির পর আসবে। আমি ভাবতেছি তারা হিস্ট্রি নিতে গেলে কী হবে। রোগী বুঝবেনা ছোট ডাক্তারের কথা আর ছোট ডাক্তার বুঝবেনা রোগীর কথা। যেমন নেপালী বন্ধু রোগীকে বলবে, "আপকা পরবলেম কেয়া হে" "দূর ব্যাটা বাংলা মাথ"
"সরি, মে 'মাথ' কা মাতলাব নাহি সামজা। কেয়া 'মাথ' কই পেইনফুল কন্ডিশন হে ?"
"কন্ডিশন পাইতাম কই ? ফ্যানটাই ভালামত চলে না"
কিছুতেই হিসাব মিলাতে না পেরে নেপালী কিছুক্ষণ টলটল করে তাকিয়ে আবার বলবে,
"মাথ কাব বাড়তা হে। রাতমে ইয়া দিন মে ?"
"কি কস কিছু বুঝিনা ।"
অতঃপর নেপালী চিফ কমপ্লেইনে লিখবে,
"পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম 'মাথ' ফর লাস্ট থ্রি ডেইস !!!"

Itemosis-একটি রোগের নাম

ফাইরুজ ইসলাম দ্বীপি,১৯তম ব্যাচ, মেডিকেল কলেজ ফর ওমেন

Disease : itemosis ,
Cause : এই রোগটা তখনই হয়, যখন কারোর উপর একশ একটা আইটেম পেন্ডিং হিসেবে জমা হয় !
Agentঃ : দয়ামায়াহীন টিউটরিয়াল টিচাররা ।
Host : মেডিকেলের নাদান বাচ্চা পোলাপাইনরা ।
S/S : signs হচ্ছে hypersomnia, hypertension, পড়াশুনার প্রতি বিরক্ত ভাব আসা, ব্যাচ টিচারদের হাসিটাও সহ্য করতে না পারা। সবসময়ে উদভ্রান্তের মতো বই-খাতা-নোটস হাতে টিচারদের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি।
Symptom হিসেবে রয়েছে passmark deficiency . এছাড়াও চেহারাটা রাস্তার পাগলটার মতো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
Risk group: থার্ড ইয়ার আর ফোর্থ ইয়ারে পড়বার সময়ে এই রোগটা বেশী হয়।
Fate: এই রোগের শেষ পরিণতি হচ্ছে, not applicable for assessment / term/ card examination.
Treatment : আঁতেলদের জন্যে, মন দিয়ে , জান প্রাণ দিয়ে দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা পড়াশোনা করা.
[ফাঁকিবাজদের জন্য অবশ্য কোনো ট্রিটমেন্ট নাই]
Prevention & Control : এর কোনো long term prevention & control নাই। সারাজীবনই চলতে থাকবে (up to MBBS)

ছবিঃ ত্রিভুজ, প্রেম সুলতানা জাহান, ৩য় ব্যাচ, কক্সবাজার এমসি

মশোলোজী

ডাঃ সাকিব আল নাহিয়ান,১৩তম ব্যাচ, জহুরুল ইসলাম এমসি

গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপারটা খেয়াল করছি। সারাদিন কোন খবর নাই,রাত ১০টা বাজতে না বাজতেই রুমের মধ্যে একপাল মশা এসে ঢুকে। আমার রুমের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে ডিশের লাইন ঢুকেছে। জানালাটা তাই সামান্য খোলা থাকে। মশা হয়ত ওইদিক দিয়েই ঢুকে। কিন্তু কথা সেইটা না। দিনের বেলার কথা বাদ দিলাম, রাত ১০টা পর্যন্ত মশাগুলা কই থাকে? মশা খুবই রহস্যময়!

বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার উপর ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। গলা পর্যন্ত কাঁথা টানা। বুকের উপর মোটা একটা গল্পের বই খুলে পড়ছি। একটু পরপরই মশা এসে কানের সামনে "চুনারি চুনারি" টাইপ গান গেয়ে যাচ্ছে। যতবারই হাত নেড়ে তাড়াতে যাই, ততবারই ধাক্কা লেগে বইটা বন্ধ হয়ে যায়। বইটায় ফিতাব্যবস্থা নাই। প্রতিবার পাতা উল্টায়ে উল্টায়ে শেষ কোন পর্যন্ত পড়েছি তা খুঁজে বের করতে হয়। বিশাল সমস্যা।

গল্পের বইটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। মেজাজ খারাপ করে উঠে বসলাম। গুনে দেখলাম আন্দাজ ১০ থেকে ১৫টি মশা হবে। এইগুলাকে সাইজ করতে হবে। আধাঘন্টা থাপড়ায়ে রস-আলোর উপরে ১৩টা মশা জমাইলাম। বিশেষ লাভ অবশ্য হলনা। ডিফিউসনের সংজ্ঞা হল রুমের ভিতর এবং বাইরের মধ্যে সাম্যাবস্থা না আসা পর্যন্ত মশার আদানপ্রদান চলবেই। ডিফিউসন প্রক্রিয়া চালু থাকল। আমিও উদাস মনে সেইদিক তাকায় থাকতে থাকতে মনে মনেই এর ব্যাসিক ফিজিওলোজিটা একবার রিভিশন দিয়ে নিলাম।
আমার বাসার নিয়ম মোতাবেক মশার স্প্রে ইউজ মাকরুহ। মাকরুহ দুই রকমের।

একটা হালালের পর্যায়ের,আরেকটা হারামের পর্যায়ের। মশার স্প্রে এক্ষেত্রে হারামের পর্যায়ের মাকরুহ। মশা মারার একটা ব্যাট অবশ্য ছিল। দুইদিন আগেই ওইটার উপর ভুলে বসে পরেছিলাম। কেন জানি চড়াৎ চড়াৎ করে দুইবার শব্দ হয়েছিল। মশা মারার জন্য এখন ওইটার বাটন টিপলে শুধু দুইবার চড়াৎ চড়াৎ করে শব্দ হয়,মশা আর মরে না।

একটা অলআউটের ডিব্বাও ছিল। বাসায় সকালে যে কাজের মহিলাটা আসে,সে প্রায়ই নিজের পছন্দ মত কিছুনা কিছু নিয়ে যায়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে পানের ডিব্বা খুলে আর পান চিবায়। পানপিপাসু এমন কারও ডিব্বাজাতীয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

বাকি থাকল মশাজগতের প্রাচীন শত্রু মশারি!
পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিরক্তিকর কাজের একটি হল মশারি টাঙ্গানো। দুই কোণা টাঙ্গানোর পর দেখা যাবে পুরাই উল্টা টাঙ্গানো হয়েছে। সোজা করে আবার দুই কোনা টাঙ্গানোর পর দেখা যাবে এক কোণার দড়ি নাই। বহু খুঁজে দড়ি পাওয়া গেলে দেখা যাবে দেয়ালের এক কোণায় আগে পেরেক ছিল,এখন নাই। পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিরক্তিকর কাজের একটি হল মশারি গুঁজা। যত ভালো করেই গুঁজা হোক না কেন একটা মশা ঢুকবেই। মশারি গুঁজে এসে আবার গুলাম। চাঁদের কলঙ্ক থাকে,মশারিতেও ছোটবড় ফুটা থাকে। গলা পর্যন্ত কাঁথার নিচে গুয়ে, বুকের উপর মোটা গল্পের বই নিয়ে মশারির মাঝারি সাইজের একটা ফুটার দিকে তাকিয়ে আছি। লিওকোসাইট রোলিং,অ্যাডহেসন আর মারজিনেসন প্রক্রিয়ায় ক্যাপিলারির ফুটা দিয়ে বের হয়। মশারাও দেখি একই প্রক্রিয়ায় মশারিকে ক্যাপিলারি বানায়। আমিও সেইদিক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে মনেই এর ব্যাসিক প্যাথোলোজীটা একবার রিভিসন দিয়ে নিলাম।

মুখস্থকে না বলুন

ডাঃ নির্ঝর অলয়,৪৩তম ব্যাচ,রাজশাহী এমসি

-বাবা, পার্কের বই আছে?
-জ্বী স্যার।
-মেডিকেল সায়েন্স কি সায়েন্স না আর্টস?
-স্যার, সায়েন্স।
-সায়েন্স তো বাবা নিজের ভাষায় বানিয়ে বললে হবে না। আর্টস বানিয়ে বলার বিষয়,আর সায়েন্স কীসের বিষয়?
-জ্বি স্যার, মুখস্থের।
-হ্যাঁ, এইবার ঠিক আছে, যাও।
এগুলো ছিল একজন সহযোগী অধ্যাপকের করা প্রশ্নসমূহের শেষ অংশ।
ময়দানঃ দ্বিতীয় বৃত্তিমূলক পরীক্ষার 'পানিপথ'
বিষয়ঃ কমিউনিটি মেডিসিন বা জনস্বাস্থ্য।

ছাত্রটি প্রায় সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছিল। কিন্তু উত্তরের ভাষা, পরীক্ষকের বাইবেল পার্কের টেক্সটবুকের সাথে হুবহু মিলছিল না। দাঁড়ি-কমা, বাক্যের গঠন মিলছিল না! যাইহোক ৩-৪ মাস পরে রেজাল্ট দিলে দেখা গেল ছাত্রটি ওই বোর্ডে টেনেটুনে ৬০ অর্থাৎ পাস-মার্ক পেয়েছে। ভাগ্যিস ছেলেটা আবেগের বশে সত্যিটা বলে বসেনি যে, বিজ্ঞান 'বোঝার' বিষয়। ওটা বললেই নির্ঘাত ফেইল!
আমাদের দেশে মেডিকেল কলেজের ভর্তিপরীক্ষা থেকে শুরু করে শেষ বৃত্তিমূলক পরীক্ষা পর্যন্ত শুধুই মুখস্থবিদ্যার জয়জয়কার! আমাদের সময় ভর্তি পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন এসেছিল,"বেনজিনের সান্দ্রতাঙ্ক কত?"
অথচ এর চেয়ে অনেক অনেক বুদ্ধিদীপ্ত ও যৌক্তিক প্রশ্ন ছিল। ঠিক এভাবেই অগণিত মেধাবী শিক্ষার্থীর পাশাপাশি অন্ধের মতো মুখস্থকারী কতিপয় তোতাপাখিরাও মেডিকেল কলেজে ঢোকে এবং এই মনুষ্যত্ববোধহীন তোতাপাখিদের একটা অংশই পরবর্তীতে নানা কুকীর্তি করে এই মহান পেশার সবাইকে বদনামের ভাগীদার করে। এটা একটা দুঃখজনক সত্য যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম এখনো ইংরেজি হওয়া সত্ত্বেও অনেক মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজির জ্ঞান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পর্যায়ের। এর ফলে তারা অধীত বিদ্যার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না। গ্রুপস্টাডির সময় আমার অনেক বন্ধুকেই দেখতাম শব্দের মানে না জেনেই মুখস্থ করছে এবং ভালো স্মৃতিশক্তির জোরে ওগুলো পরীক্ষার হলে উগড়ে দিচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মত একটা প্রয়োগমুখী বিদ্যা না বুঝে মুখস্থ করার ফলাফল কখনোই শুভ হওয়ার কথা না! অ্যাপেন্ডিক্সের বিভিন্ন অবস্থানগুলোর পার্সেন্টেজ আমাদের দশমিকের পরের ঘর পর্যন্ত মুখস্থ রাখতে হত, অথচ দেখা গেল, একটা স্টাডিতে সম্পূর্ণ উলটো ফল পাওয়াতে ওই পার্সেন্টেজগুলো "গ্রেজ" অ্যানাটমি"র ৩৯ তম সংস্করণে বর্জন করা হয়েছে! বিভিন্ন ল্যাবরেটরী ভ্যালু আমাদের দশমিকের পরের ৩ ঘর পর্যন্ত মুখস্থ করতে হতো। আমাদের বায়োকেমিস্ট্রির টিউটোরিয়ালের ম্যাডাম তো এসব মানে একটু ভুল হলেই খেপে গিয়ে বলতেন, "এইজন্যেই তো এখনকার ডাক্তারদের এই অবস্থা, কাগজে রেফারেন্স ভ্যালু লিখে দেওয়া থাকে!"
ম্যাডাম কি জানেন যে, USMLE পরীক্ষায় এই ল্যাবরেটরী রেফারেন্সগুলো পরীক্ষার সফটওয়্যার এ দেওয়াই থাকে এবং প্রয়োজন মত পরীক্ষার্থী সেটা দেখে নিতে পারে!
কিন্তু ওই দেখা মানগুলো এবং ডেটাগুলো বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাই পরীক্ষায় দেখা হয়। আমাদের চলতি এম.বি.বি.এস. কোর্সে মাত্র ১০-২০% প্রবলেম বেজড প্রশ্ন থাকে এবং এগুলোতে বিশ্লেষণী ক্ষমতার কোন পরীক্ষাই নেওয়া হয় না। যেকোন রকমের রিসার্চ রীতিমত নিরুৎসাহিত করা হয়! আমাদের প্রফেসররা খুব বড় গলায় দাবী করেন যে, আমাদের মেডিকেল শিক্ষা বিশ্বমানের। এটা হুবহু ব্রিটিশ মডেলের ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ রহস্যজনক কারণে এই বিশ্বমানের ডিগ্রী নিয়ে এমনকি যাদের মডেলে এই পদ্ধতি গড়া সেই বিলেতেও বিনা পরীক্ষায় প্র্যাকটিস করার সুযোগ মেলেনা! শুধু তাই নয় কোন ভাল ক্লিনিক্যাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তিও হওয়া যায় না। প্রকৌশলবিদ্যার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তো এটা হয় না! তবে কি আমাদের মেডিকেল শিক্ষা বিশ্বমানের নয়? উত্তর হল, নয় এবং আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। কিন্তু এটাও সত্যি যে বিশ্বমানের চিকিৎসক আমাদের বেশ কয়েকজন আছেন। তাঁদের যে অল্প কয়েকজনের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা সবাই বলেছেন যে তারা সেলফ মেইড,অর্থাৎ এই অনন্যসাধারণ চিকিৎসকদের জন্য আমাদের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা কোনরকম কৃতিত্বের দাবীদার নয়! সারা বিশ্ব এখন ধীরে ধীরে "প্রবলেম বেইজড লার্নিং" এর দিকে এগুচ্ছে, আর আমরা পোস্টগ্র্যাজুয়েট লেভেলেও আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলের মত এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি মুখস্থ করে বেড়াচ্ছি! এ নিয়ে আলোচনাও অনেকে বুঝতে পারে না।
বিশ্বের সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. এবং এম.ডি. কোর্সে বর্তমানে একেবারে শুরু থেকেই "প্রবলেম বেজড লার্নিং" উৎসাহিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমবর্ষ থেকেই শিক্ষার্থীরা হাসপাতাল ও রোগীর সংস্পর্শে এসে এনাটমি-ফিজিওলজির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো শেখে। ধরুণ ফার্মাকোলজিতে কার্ডিয়াক ড্রাগসগুলো পড়াচ্ছে। ঠিক ওই সময়েই যদি ওই ব্যাচকে হাসপাতালের কার্ডিওলজি ওয়ার্ডে প্লেসমেন্ট দেওয়া যায় তো তাদের জ্ঞান অনেক পাকা হয়। কিন্তু ফার্মাকোলজিতে ওটা পড়ার ছ'মাস পর ওয়ার্ডে প্লেসমেন্ট হলে আগের পড়ার ছায়ামাত্র মনে থাকে না। আমরা এটা ভুলেই গেছি যে, গ্রে সাহেব তার এনাটমি বইখানা মুখস্থ করে লেখেননি, অসংখ্য শবব্যবচ্ছেদ করে, দেখে লিখেছেন। অথচ বাংলাদেশের কয়টা মেডিকেল কলেজে যথাযথভাবে ডিসেকশন শেখানো হয়। প্রায় সবই বই দেখে মুখস্থ করতে হয় বলে এনাটমির অপর নাম হয়ে দাঁড়ায় আতঙ্ক। আমাদের মেডিকেল কলেজে এনাটমির শব আর হাসপাতালে অঢেল রোগী- এটা আসলেই শিক্ষার বিশাল সুযোগ এবং এ কারণে সত্তরের দশকে এমনকি শুনেছি আশির দশকেও দক্ষ ক্লিনিশিয়ান হিসেবে আমাদের ডাক্তারদের নাম ছিল। বিলেতের ডাক্তাররা এখানে আসত ইন্টার্নশিপ করতে এবং তাদের আমরা তাত্ত্বিক চিকিৎসক হিসেবে খেপাতাম। কিন্তু গত দুই দশকে বায়োমেডিকেল সায়েন্সের অভাবনীয় উন্নতির ফলে বিলেত আমাদের ছেড়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে। আমাদের শিক্ষামূলক এবং সেবামূলক হাসপাতালগুলো অভিন্ন হওয়ায় অত্যধিক রোগীর চাপে একাডেমিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসাসেবার মান গোটা বিশ্বের মধ্যে ৬৯ তম এবং সার্বিক সেবায় আমরা ভারতের চেয়ে এগিয়ে। অর্থাৎ চিকিৎসাসেবায় আমরা বিশ্বের মানদণ্ডে মাঝারি মানের। কিন্তু আমাদের মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থা অনেকাংশেই বিশ্বমানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। এ কারণেই PLAB, USMLE, AMC পরীক্ষায় না পাস করলে আমাদের ডাক্তাররা ওসব দেশে উচ্চশিক্ষার ও প্র্যাকটিসের সুযোগ পান না!
কাজেই সময় এসেছে, আমরা মেডিকেল সায়েন্সে বিশ্বমানের, এই ফক্কিকা ছেড়ে মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে মন দেওয়া। এখনো এদেশে অনেক শিক্ষক এনাটমির ক্লাসে নানারকম ভাবধারা জাগিয়ে তোলেন, এমব্রায়োলজি পড়াতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক রেফারেন্স দেন অথচ একটা ভালো অ্যানিমেশন দেখাতে পারেন না!
আজো এখানে চল্লিশ জন ছাত্রের ব্যাচ করে সমন্বয়বিহীনভাবে বিষয়গুলো পড়ান হয়। অথচ আমরা একটু সৎ হলে, একটু উদ্যমী হলে আর সামান্য বিনিয়োগ বাড়ালে সত্যিই বিশ্বমানের মেডিকেল শিক্ষা দিতে পারি, যার ভিত্তি কখনোই মুখস্থবিদ্যা নয়, বরং বিজ্ঞানসম্মত প্রায়োগিক বিদ্যা। অবশ্য অনেকে এই লেখা পড়ে বলবেন যে, আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ বলেই এই লেখার অবতারণা! আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বিদ্যাসাগর মশাই মুগ্ধবোধ মুখস্থ করতে খুব কষ্ট পেতেন, তাই বড় হয়ে তিনি মুগ্ধবোধ বধ করেছিলেন, ব্যাকরণ-কৌমুদী লিখে! আমার সে সামর্থ্য নেই, কিন্তু আশা আছে- একদিন এদেশের তরুণ চিকিৎসকেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মত করেই শেখানোর ব্যবস্থা করবে এবং জীর্ণ প্রথাবদ্ধতার অবসান ঘটবে।

World's 1st Ambulance

কাউন্সেলিং

আমি তোমারি দিকটা নিলামঃ

ডাঃ জাকির হোসেন হাবীব,৩০তম ব্যাচ, রাজশাহী এমসি,সহযোগী অধ্যাপক(মাইক্রোবায়োলজি),স্যার সলিমুল্লাহ এমসি।

অর্থোপেডিক সার্জন আমার এক বন্ধু ছয় মাসের এক ট্রেনিং এর জন্য ভারতের তামিলনাড়ু গেছে। গতকাল রাতে সে ফোন করলো উত্তেজিতভাবে। তারপর রুদ্ধশ্বাসে উত্তেজিতভাবে বলে গেল তার অভিজ্ঞতা। প্রথম যখন সে ভারতে এই ট্রেনিংটায় চান্স পায় তখন তার মধ্যে একধরণের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছিল ভারতে ট্রেনিং নিয়ে। তবে সেখানে গিয়ে সেখানকার হাসপাতালে কাজের মান দেখে সে স্তম্ভিত। স্তম্ভিত তাদের অবিরাম কাজ করে যাওয়া দেখে, তাদের পরিশ্রম করার ধারা দেখে। বললো, 'তুই বিশ্বাস করবি না এখানে আমাকে সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। শুধু আমি না আমার মত সবাই এই হারে কাজ করছে এমন কি বয়স্ক প্রফেসররাও। আমার তো রীতিমত কয়েক কেজি ওজন কমে গেছে এই দুই মাসে। তবে তার পরও Satisfection আছে অনেক কিছু শিখছি যা আগে চিন্তা করতেও পারতাম না। ওরা কোন পর্যায়ে এগিয়ে গেছে তা তুই চিন্তাও করতে পারবি না ইত্যাদি।

মেডিকেলে পড়ার সময় 'কাদা ভাই' বলে একজন ছিলেন আমাদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয়। শ্লীল-অশ্লীল কথা বলে উনি মজা করতেন, একেক সময় একেকজনকে পঁচাতেন। বিশেষ করে তার টার্গেট ছিল সেই সব ভাল ছাত্র যারা মূলত পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। উনি নিজে পড়াশোনা বিশেষ করতেন না, যারা নিয়মিত পড়াশোনা করতো তাদের পছন্দও করতেন না। আমাদের মন জুগিয়ে কথা বলার কারণে আমরা তাকে বেদম পছন্দ করতাম এবং সচরাচর তার বিরাগভাজন হতে চাইতাম না। কিঞ্চিৎ নেশাসক্ত ও ছিলেন তিনি, পছন্দ করতেন যারা তার সঙ্গী হত অথবা তাকে তাল দিয়ে চলতো। মূলত যে সব সিনিয়র ভাইরা তখন এ জাতীয় উক্তি করতেন তাদের আমরা খুবই পছন্দ করতামঃ ১) আরে ধুর মিয়া আইটেমের জন্য এত পড়ার কি আছে?
২) ওই যে গাধাটা গ্রে নিয়া সারাদিন ঘুইরা বেড়ায় ও সবার আগে সাপ্লি খাইবো।
৩) সারা বছর ধইরা এত পড়ার কি আছে? এতই যদি পড়ব তাইলে ওই গাইড বইগুলি লেখছে কি করতে?
৪) যে গাধাগুলি ফাস্ট বেঞ্চে বইসা আছে কামের সময় ওইগুলার কোন খোঁজই পাওয়া যাইব না ইত্যাদি, ইত্যাদি।
বিশেষ করে কাদা ভাইয়ের রোষানলে ছিলেন ভালছাত্র গুডিবয় 'ইমরান' ভাই। তাকে সময়ে অসময়ে শ্লীল-অশ্লীল ভাষায় কটু কাটব্য করা ছিল তার নিত্যকার অভ্যাস। আমরা অনেকেই তার দ্বারা উৎসাহিত হতাম এবং আঁতেলের মত গ্রে-গাইটন নিয়ে থাকে যেই গাধারা তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করতাম। মনে আছে আমাদের ক্লাসের ভাল ছাত্র 'ময়েজ' একদিন স্যারের লেকচারের সময় কি একটা প্রশ্ন করার জন্য দাঁড়াল। কাদা ভাইয়ের এক শিষ্য আমাদের বন্ধু তার পশ্চাতদেশে কলমের খোঁচা দিয়ে বললো, 'বাজে কথা বলিস কেন?'
তখন ফেন্সিডিলের নেশায় আচ্ছন্ন রাজশাহী শহর। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবও তার বাইরে নয়। যথারীতি বাইরে নয় কাদা ভাইও।
যারা তার মত আসক্ত ছিল তাদেরকে উনি বিশেষ স্নেহ করতেন। একদিন আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে দুপুর বেলায় চারু মামার কেন্টিনে বসে চা খাচ্ছি। এমন সময় কাদা ভাই কেন্টিনে আসলেন। এই ভর দুপুরে আমাকে চা খেতে দেখে তিনি অতিশয় সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর আমার বন্ধুটির দিকে চোখের ইশারায় কিছু জানতে চাইলেন। আমার বন্ধুটিও সেয়ানা কম না। সেও ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিল। কাদা ভাইয়ের হাসি এবার কান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। উনি সেখান থেকে যেতে যেতে হৃষ্টমনে বললেন, 'সবাইকেই একদিন এইপথে আসতে হবে'।

বহুদিন পরে ডিজি অফিসে কাদা ভাইয়ের সঙ্গে একদিন দেখা। উপজেলাতে পড়ে আছেন। কোন ডিগ্রি করতে পারেন নি। তার স্বভাবসুলভ হাসিটা মলিন। জীবন যুদ্ধের কঠোর ছাপ তার সর্বাঙ্গে।
ইমরান ভাই এখন Paediatric surgeon হিসেবে বাইরের একটি দেশে কর্মরত।

আজ আমি শিক্ষক। আমি জানি সময়ের সাথে কিছুই বদলায় না শুধু মোড়কটা বদলায় মাত্র। আমি জানি কাদা ভাইরা আজো মেডিকেলে জনপ্রিয় আর ইমরান ভাইরা এখনো হাসি ঠাট্টার অনুষঙ্গ। আমি জানি আজ যদি লিখি- এত পড়ার কি দরকার, জীবনটা উপভোগ করো কিংবা স্যারদের ওইসব বোগাস লেকচার শোনার চেয়ে গাইড পড়, শর্টকাটে পাশ কর, জীবন উপভোগের এইতো সময়, স্যাররা কী জানে, তারা তো দলবাজি নিয়েই ব্যস্ত ইত্যাদি তবে কাদা ভাইয়ের চেয়েও বেশি জনপ্রিয়তা আসবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে। কিন্তু আমি তা বলবো না। আমি বরং বলবো

১) বড় কিছু পেতে গেলে বড় কিছু বিসর্জন দিতে হয়, অনেক চাওয়া পাওয়াকে বিসর্জন দিতে হয়।

২) সহজে যা পাওয়া যায় তা কখনো স্থায়ী হয় না-Easy come easy go।

৩) মেডিকেলে এক একটা ডিগ্রী অনেক অশ্রু, অনেক ত্যাগ আর অনেক দীর্ঘশ্বাসের ফসল।

৪) শিক্ষকদের সবচেয়ে বাজে লেকচারটিতেও এমন কিছু তথ্য থাকে যা পরবর্তীতে জানতে গেলে অনেক কাঠ- খড় পোহাতে হয়।

৫) একটা টেক্সট বই পড়া ছাত্রকে যেভাবে বিষয়ের গভীরে নিয়ে গিয়ে আরো পড়ার উৎসাহ জোগায় এবং Clear conception দেয় তা শর্টকাট গাইডবুক দিতে পারবে না। হ্যাঁ পাশ হয়ে যাবে তবে বিষয়ের গভীরে না গেলে এই জ্ঞান স্থায়ী হবে না।

Its your life. It is you who will decide how you will spend it.

যারা কাদা ভাইয়ের অনুসারী হতে চায় সেটা তাদের ইচ্ছা। আমি জানি তারাই সংখ্যায় বেশী। তাদের প্রতি আমার বিশেষ কোন রাগ-অনুরাগ নেই।

তবে আমি এও জানি ইমরান ভাইয়ের অনুসারীরাও নেহায়েত কম নয়।

কাদা ভাইয়ের অনুসারীদের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ। আপনি আপনার পথে চলুন কিন্তু প্লিজ ইমরান ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করবেন না।

গ্রামগঞ্জ থেকে অনেক ইমরান ভাই ও তার অনুসারীরা এসেছে তাদের দরিদ্র অসহায় পিতামাতার স্বপ্ন পূরণে। তাদের একটাই চাওয়া- তারা বড় ডাক্তার হতে চায়। তাদের চোখে আজহার স্যার, দীলিপ স্যার কিংবা মাহবুব স্যার হওয়ার স্বপ্ন। প্লিজ তাদেরকে তাদের মত চলতে দিন। আর সবশেষে সেই কষ্টকর, ক্লান্তিকর, সংগ্রামমুখর পথের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই মান্নাদের সেই অবিস্মরণীয় গানঃ

এধারে দুফোঁটা চোখের জল
ওধারে অথৈ সাগর অতল
তবু সমুদ্র ছেড়ে চোখের ই জলটা
বুকে করে আমি গেলাম
আমি তোমারি দিকটা নিলাম।
এখানে কাঁটালতায় একটি ফুলের দোলা
ওখানে বসন্ত হাজার ফুলের মেলা
এপাশে শঙ্কা চিন্তার দিন
ওপাশে সময় ভাবনা বিহীন
তবু নির্ভাবনার শান্তিকে ছেড়ে
অশান্তি নিতে এলাম
আমি তোমারি দিকটা নিলাম।

(সকল চরিত্র কাল্পনিক)

নেশা

ডাঃ মোঃ মারুফুর রহমান অপু, ৩৫তম ব্যাচ, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

মেডিকেলে ভর্তির পরে উত্তেজনার রেশটা মোটামুটি মাসখানেক থাকতে দেখেছি। আইটেম, কার্ড, টার্ম এর চাপ শুরু হয়ে গেলে শুরুর দিকে অনেকেই হতাশায় ভোগে। এর মাঝে একটা বড় অংশ দেখা যায় মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছাই ছিল না, পারিবারিক চাপে ভর্তি হয়েছে, তাদের জন্য ব্যাপারটা আরো গুরুতর। এইসব হতাশাও একসময় থাকে না, বেরিয়ে আসে বেশিরভাগই। তবে আমি পারিনি। নটরডেমে খুব নিয়মিত ছাত্র ছিলাম, এখানে এসে বিস্ময়ে লক্ষ্য করি আমি ঠিকমত ক্লাস করছি না। হয়ত ঘুমাচ্ছি, ঘুরতে যাচ্ছি, পিসি চালাচ্ছি ইত্যাদি করে সময় কাটাচ্ছি। এভাবে একসময় অনিয়মিত হয়ে যাওয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল, ঘুম আমার ভেঙ্গেছিল প্রফের আগে, নিজেকে পড়ে যাবার হাত থেকে বাঁচাতেই হয়ত উঠে দাঁড়ালাম, নিয়মিতভাবেই পরীক্ষা দিলাম পাশ ও করলাম। আজকের লেখার উদ্দেশ্য এটা নয়। হোস্টেলে থাকার সুবাদে, নানারকম মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছিল। দেখলাম ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকম বিভাজন তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ নিয়মিত পড়াশোনা ক্লাস করছে, কেউ কেউ সক্রিয় রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত, কেউ প্রেম করছে চুটিয়ে ইত্যাদি নানা শেণী। বিস্ময়টা একসময় আরো বাড়ল যখন দেখলাম এইসব শেণী ছাড়াও আস্তে আস্তে আরো একটি শ্রেণী তৈরী হচ্ছিল। ওরা দিনে ঘুমাতো, রাতে জাগত। ওদের দরজা বন্ধ থাকত সবসময়। দরজা খুললে সিগারেট আর ক্যানাবিস (গাঁজা) এর মিশ্রিত গন্ধ পাওয়া যেত। অগোছালো নোংরা রুমে সময়ের সাথে সাথে আরো অন্ধকার জমাট বাধতে থাকে। কেউ ব্যক্তিগত হতাশায়, কেউ সমষ্টিগত হতাশায়, কেউ শুধু মজা দেখতে, কেউ কোন কারণ ছাড়াই এই দলে ঢুকে যেত। নিকোটিন, ক্যানাবিসের গণ্ডি পেরিয়ে, ঝাঁঝালো তরলের বোতল খালি করে লাল লাল বড়ির দিকে যেতে থাকল। রক্তমাংসের বাবার চেয়ে ওষুধের বাবাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। মাঝে মাঝে ৭.৫ মিলিগ্রাম জাতীয় শব্দ শুনতাম, শুরুতে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারি ওটা মিডাজোলাম, এটাও নাকি এক নেশার বস্তু কিংবা সহায়ক কিছু। আমি জানিনা অন্যরা এমনটা দেখেছে কিনা তবে আমি বেশ কিছু মেডিকেল এর হোস্টেলে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে, জাহাঙ্গীরনগরের হোস্টেলে এইসব জমাট অন্ধকারকে দেখেছি।

হাজার হাজার প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে দেশের সেরা মেধাগুলো কেন করছে এইসব? আসুন একটু চিন্তা করে দেখিঃ

ড্রাগ এবিউজ কি এবং কেনঃ

কিছুদিন আগে ড্রাগ এবিউজ এর উপরে একটা কোর্স করেছিলাম। সেখান থেকে কিছু তথ্য শেয়ার করছি। মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, প্রেসক্রিপশন ড্রাগ এবিউজ, ইলিগাল ড্রাগ এবিউজ।

দ্বিতীয়টির সাথে আমরা সবাই পরিচিত, হেরোইন, গাঁজা, ডেট রেপ ড্রাগ, ইয়াবা ইত্যাদি। কোন ডাক্তার এগুলোকে প্রেসক্রাইব করেন না। বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে এগুলো এবিউজারদের হাতে এসে পৌছায়। এবার আসি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ এর কথা। এগুলোতো ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেন, এগুলো কি এবিউজ হওয়া সম্ভব? আমেরিকায় আপনি প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন ওষুধ কিনতে পারবেন না এবং আপনার প্রেসক্রিপশনটি ওরা রেখে দেবে বা এন্ট্রি করে রাখবে যেন অতিরিক্ত ওষুধ অন্য কোথাও থেকে নিতে না পারেন, তারপরেও ওদের দেশে রোড এক্সিডেন্টে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় এই প্রেসক্রিপশন ড্রাগ এবিউজ এর কারণে! এবার চিন্তা করেন আমাদের দেশের অবস্থা। প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনি যেকোন ওষুধই কিনতে পারবেন! আর কোয়াক কিংবা দোকানদার যখন ডাক্তার এই ধরনের সমস্যা তো আছেই। ওসব দিকে না যেয়ে যেখানে ছিলাম সেদিকেই নজর ফেরাই। মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে নেশার বীজটা ঢোকে কিভাবে বা তারা কি ধরণের নেশা করে?

আচ্ছা একটা প্রশ্ন, সিগারেট কি নেশা? উত্তরটা আপনারাই দিন আমি বরং কিছু জ্ঞানের কথা বলি।

দীর্ঘদিন ধরে যারা নেশা করছে তারা কেন এর থেকে বের হতে পারে না? এর কারণ খুবই সহজ, ড্রাগ এর প্রভাবে তাদের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে তারা স্বাভাবিক থাকতে ড্রাগ নেয়া শুরু করে, ড্রাগ না নিলে তাদের উইথড্রয়াল সিন্ড্রোম দেখা দেয়। তাদের সারাটা দিন অতিবাহিত হয় কিভাবে এই ড্রাগটা আমি পাব, কিভাবে টাকা যোগাড় করব ইত্যাদি নিয়ে।

নিকোটিন কি এই ধরণের কোন সমস্যা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে, নিকোটিন এবং ক্যাফেইন শরীরের জন্য এক ধরনের উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। বার বার এগুলোর ব্যবহারের ফলে দেখা গেছে শরীর এই উত্তেজকের উপস্থিতিকে এডাপ্ট করে নেয়। এর অভাবে সাধারণ কর্মকান্ড ব্যাহত হতে থাকে। মানবেন কিনা জানিনা যারা খুব বেশি চা কফি খান তাদেরও দেখবেন যেকোন কাজ শুরু করার আগে কিংবা দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ চা কফি না খেলে তারা অস্থির হয়ে পড়েন। সিগারেট এর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আরো বেশি সত্য। মাঝরাতে একটা সিগারেট কিংবা লাইটারের জন্য মাইলখানেক হেঁটে যাবার কথাও শোনা যায়। তাহলে সিগারেটকে কি আমরা এডিকশন বলব?আমরা এটা কে এবিউজ বলতে পারি, এই হল শুরু।

কলেজ লাইফ পেরিয়ে হোস্টেলে থাকা শুরু করলে স্বাধীনতার আস্বাদন পেতে শুরু করে। সেই আনন্দে আগে যারা সিগারেট খেত না তারাও ধরে ফেলে, আর যারা খেত তারা তো এবার যখন তখন যেভাবে খুশি খেতে পারে। তো এই সিগারেট খাওয়া নিয়ে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়, দলবেঁধে সিগারেট খাওয়াও একটা মজার ব্যাপার। বিভিন্ন রকম বাজিও হতে থাকে সিগারেট নিয়ে, পুরষ্কার হিসেবে সিগারেট কিংবা জন্মদিনের উপহার হিসেবেও! অনেককে ডিপ্রেশন থেকেও সিগারেট খেতে দেখেছি। তো এইসব ব্যক্তিগত দুঃখ জমা হতে থাকে, হয়ত শেয়ার করার মত আরো কয়েকজন দুঃখী মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায়। সিগারেটে তখন আর জমে না। একটান ক্যানাবিস না হলে জমছেই না। সুতরাং অন্ধকার রুমে প্রবেশের এই হল শুরু। শুধু যে হতাশা থেকেই এটা শুরু হয় তা নয়, আনন্দ উদযাপনের জন্যেও চলে। সময় কাটানোর জন্য ভরসার তাশ তো আছেই। ২৯ কিংবা পোকার চলতে থাকে, বাজির খেলাও শুরু হয়। ক্যানাবিস সেবন এর নানা রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, নিমাই খেলা ইত্যাদি নানারকম খেলাও আবিষ্কৃত হয়!

এই সার্কেলে মাঝে মাঝে বিশেষ দিন আসে, কারো জন্মদিন, কারো ব্রেকআপ, কারো অন্য কোন বিশেষ হতাশা/আনন্দ, নাহ তরল ছাড়া জমছেই না। বড় বড় সুদৃশ্য বোতলের আমদানি শুরু হয়। এর মধ্যে অনেকেই সার্কেল ছেড়ে বেরিয়ে যায়, নতুন যোগও হয়, একটু চেখেই দেখিনা, মুভিতে তো হরহামেশাই দেখছি, কি হবে একদিন খেলে। উদ্ভাবন চলতে থাকে এগুলো ঘিরেই, পানি লাগবে, শুকনো খাবার লাগবে, লালের সাথে লাল, সাদার সাথে সাদা আরো নানা রকম ফর্মুলা, এরপরে সস্তা ক্যানাবিস তো আছেই,

কম্বিনেশন জমবে ভাল! অভ্যস্ত হতে থাকা শরীর ঝিমিয়ে পড়তে থাকে এলকোহল এর নেশায়, না এভাবে ঝিমিয়ে তো কার্ড খেলা যায় না! কার্ড খেলতে হলে সারা রাত জেগে থাকতে হবে। কি উপায় কি উপায়? হঠাৎ কারো পকেট কিংবা ব্যাগের থেকে তখন লাল বড়ি বের হল। অনেকে ভয় পায়, অনেকে পিছিয়ে যায়, অনেকে আর আসে না। তাও কৌতুহল অনেক বড় ব্যাপার। এই ট্যাবলেট গিলে খেলে হবে না, নানা আয়োজন আছে, পয়সা লাগে, এলুমিনিয়াম ফয়েল লাগে, লাইটার লাগে আরো কত কি, আয়োজন দেখতেই অনেকে থেকে যায়, নতুন সাদা ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নিতে হয়। সুতরাং ঝিমিয়ে পড়া শরীরকে জাগ্রত রাখতে এই হল শুরু। সিগারেট, ক্যানাবিস, এলকোহল এর পর ইয়াবা সেবন করে টানা দুই তিনদিন ধরে কার্ড খেলতে দেখেছি আমি। ক্ষুধা লাগে না, ঘুম আসে না, নার্ভগুলো সব একদিকে কেন্দ্রীভূত। বাড়ি,উল্টা বাড়ি চলতেই থাকে। ক্যান্টিন বয় হয়ত এসে মাঝে মাঝে খাবার দিয়ে যায়, সেই খাবারে সিগারেটে ছাই পড়ে এ্যাশট্রেতে পরিণত হয়। তৃতীয় দিনে ক্লান্তি আসে, কিন্তু ঘুম তো আসছে না, কি করা যায়। নাহ, ইনসমনিয়া নিয়ে রাত তিনটায় ফেইসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিতে হবে। তাও ঘুম আসছে না। তখন মিডাজোলাম এর আবির্ভাব। এক বড়ি ব্যাস শান্তির ঘুম, ১২/১৩ ঘন্টা পেরিয়ে কখনো ২৮/৪৮ ঘন্টাও ঘুমের ঘোরে কাটে। বলাই বাহুল্য এক বড়ি এদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। নতুন আরেক নেশা আবিষ্কৃত হয়। টাকা নেই হাতে, কিংবা ক্যানাবিসটাও পাওয়া যাচ্ছে না। ফার্মেসিতো পাশেই, আচ্ছা মিডাজোলাম খেয়ে যদি না ঘুমিয়ে জোর করে জেগে থাকা যায় তখন কেমন হয়? নার্ভাস সিস্টেমকে নার্ভাস করে ফেলতে চলে নতুন পরীক্ষা। ঘুমের ওষুধ খেয়ে না ঘুমিয়ে ঘুমের ঘোরে থাকা!!

আরো অনেক উদাহরণই দেয়া যেত, লেখা বেশি লম্বা করতে চাচ্ছি না। এডিকশন কি কোন রোগ? এর কি নিরাময় সম্ভব? সদিচ্ছাই কি যথেষ্ট?

এডিকশনকে ইন্টারন্যাশনালি রোগ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। এই রোগের থেকে মুক্তিও সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে সদিচ্ছাই কি যথেষ্ট? না যথেষ্ট নয়, অন্যান্য অসুস্থ ব্যাক্তির মতই চিকিৎসা প্রয়োজন। কেন শুধুমাত্র সদিচ্ছা সম্ভব নয় সেটা একটু জেনে নেই।

জ্ঞানের কথাঃ এডিকটিভ ড্রাগগুলো সবগুলোই কাজ করে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের উপর। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এক মজার পাথওয়ে আছে যার নাম "রিওয়ার্ড পাথওয়ে"।

মানুষের আনন্দ, উৎফুল্লতার জন্য এই পাথওয়ে দায়ী। প্রাকৃতিকভাবে খাবার, যৌনতা, সাফল্য ইত্যাদি কারণে এই পাথওয়ে একটিভেট হয়, মানুষ আনন্দ পায়। এই পাথওয়ের নিউরোট্রান্সমিটার তথা আনন্দের বার্তাবাহক ডোপামিন। এডিকটিভ ড্রাগগুলো এই ডোপামিনকে পুনঃশোষিত হতে দেয় না। ফলে এরা থেকে যায় অতিরিক্ত পরিমানে এবং অতিরিক্ত সময় ধরে। শুরু হয় ডোপামিন রিসেপ্টের ডাউন রেগুলেশন, অর্থাৎ সখ্যায় কমে যাওয়া। দেখা যায় দীর্ঘদিন নেশাগ্রস্ত একজন মানুষের ডোপামিন রিসেপ্টর একটিভিটি সাধারন মানুষের তুলনায় অনেক অনেক কম। তাই নেশাগ্রস্থ মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় বিষণ্নতায় ভোগে, শরীরবৃত্তীয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো বিদ্রোহ করে, ডোপামিন দাও আরো ডোপামিন চাই, সাধারন প্রাকৃতিক এক্টিভেটর গুলো তখন আর সফল হয় না চাহিদা মেটাতে। তাই স্বাভাবিক থাকার জন্য চাই নেশা! হ্যা, একজন নেশাগ্রস্ত মানুষ স্বাভাবিক থাকার জন্য আরো নেশা করে। সুতরাং তার ইচ্ছাই এক্ষেত্রে তাকে নেশা থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, অতিরিক্ত পর্ণগ্রাফির প্রতি আসক্তিও একধরনের নেশা এবং এটিও ডোপামিন রিসেপ্টর এর ডাউন রেগুলেশন এর জন্য দায়ী।

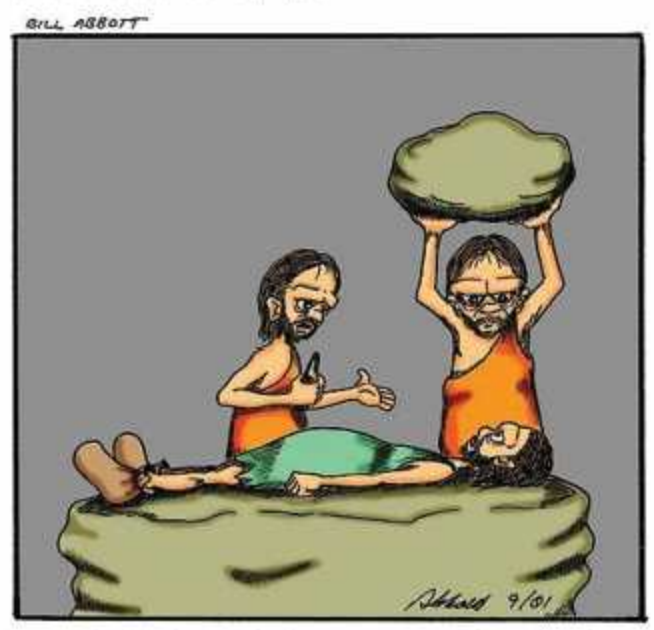

"...and this is Ralph, your anesthesiologist."

তাহলে উপায় কি?
দেশে বিশেষ করে ঢাকায় ইদানিং দেখবেন প্রচুর মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ছয় মাস আমিও এরকম একটি রিহ্যাব সেন্টারে কাজ করেছি। খুব হতাশ হয়ে সেখানে দেখেছি সুস্থ করার নামে রোগীদের সেখানে পুরোপুরি জেলখানার মত বন্দি করে রাখা হয়। ছাড়পোকা ভর্তি নোংরা বিছানা, সারাক্ষণ নিরাপত্তার তিন দরজা লাগানো, জঘন্যতম খাবার খেয়ে প্রতিটি রোগীর কন্সটিপেশন, তাদের বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম টিভি। অনেককে দেখেছি টানা ২ থেকে ৩ বছর আছেন, স্রেফ পারিবারিক সমস্যা বা টাকার লোভে আটকে রাখা। আমাদের দেশে প্রকৃত রিহ্যাব সেন্টার একটাও নেই। তাহলে আমরা কি করতে পারি?

প্রতিরোধঃ
প্রতিরোধ শুরু করতে হবে প্রথম থেকেই। সিগারেট দিয়েই হতে পারে। জানি কাজটা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। কিভাবে সিগারেট ছাড়বেন সেই পরামর্শ দেব না, ওটা নিজেই বের করতে পারবেন। মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা আছেন যারা হোস্টেলে থাকেন তারা সহপাঠীদের একটু খোঁজ রাখুন। ডিপ্রেসনে ভোগা বন্ধুদের ডেকে নিয়ে গল্প করুন, শেয়ার করুন নিজের গল্প, ব্যস্ত রাখুন পড়াশোনা, খেলাধুলা, স্বেচ্ছাসেবী গঠনমূলক কর্মকান্ডে। হয়ত আসতে চাইবে না, একজন না পারলে তিনজন যান, বলুন ঘুরতে যাচ্ছেন, কিংবা খেয়ে আসুন বাইরে থেকে, অন্ধকার জগত থেকে বের করুন। ট্যুর, সাইক্লিং, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি কাজেও উৎসাহিত করুন। হোস্টেলে এগুলো কিভাবে ঢুকছে সেদিকে নজর দিন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা সাইকিয়াট্রিক কাউন্সিলর থাকেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে এটা নেই, এমনকি মেডিকেল কলেজগুলোতে সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্ট থাকলেও তারা এই ব্যাপারে আলাদা কোন পদক্ষেপ নেন না। সুতরাং কাজটা করতে হবে নিজেদেরই। এডিকশন যদি অনেক দীর্ঘ সময়ের হয় তাহলে মেডিকেশনের এর প্রয়োজন হতে পারে, এক্ষেত্রে গার্জিয়ানের সাথে যোগাযোগ করুন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবা মা হয়ত জানেনই না যে তার ছেলে বা মেয়ে নতুন "বাবা"র সন্ধান পেয়েছে! মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী এবং ডাক্তারদের জন্য আলাদা কাউন্সেলিংএর ব্যবস্থা করার জন্য নিজ নিজ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং হাসপাতালের ডিরেক্টরদের সাথে কথা বলুন।
যারা ডাক্তার হয়েছেন, প্রেসক্রিপশন দেবার সময় খেয়াল রাখুন এবিউজ করার কোন সুযোগ আছে কিনা। বন্ধু ঘুমের ওষুধ চাইলে লিখে দেবেন না। কাউন্সেলিং করুন। আপনি যদি কোন মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ছাত্রছাত্রীদের খোঁজ নিন, কেউ না আসলে বাকিদের দায়িত্ব দিন' কেন তারা আসছে না। হয়ত এটুকু চেষ্টাই অনাকাঙ্খিত আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে পারে, হয়ত স্বপ্নের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে। আমার মেডিকেল কলেজে আমি দুটি আত্মহত্যা দেখেছি, আর এটেম্পট নিতে দেখেছি আরো কয়েকটি। এটি সহপাঠী হিসেবে আমাদের জন্যই লজ্জাজনক, অবশ্যই আমরা দায়ী, আমরা পারিনা আমাদের একজন বন্ধুকে বাঁচাতে, সুস্থ করতে, কেমন মানুষ, কেমন ডাক্তার আমরা?

কাল কোন আইটেম নেই

গান পাগল

ওমর ফারুক,৫১তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি

'প্রফ জীবনে অনেক বার আসবে কিন্তু সুমনের এই কন্সার্ট দ্বিতীয়বার আসবে না'- পশ্চিমবঙ্গের কবীর সুমনের কন্সার্ট বা প্রফের আগের দিন LRB'র প্লাটিনাম কন্সার্ট কোনটাই মিস হয়না ইশতিয়াকের। কালচারাল মেডিকেল কলেজ সিএমসিকে ইশতিয়াক ইসলাম খান মাতিয়ে রেখেছে গানের জাদুতে। না ইশতিয়াক গায়ক নয়, গানপাগল ছেলেটা গানের আয়োজক। গত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে মাইলস, জেমস, আইয়ুব বাচ্চু, হাসান, শিরোণামহীন, লালন থেকে শুরু করে হালের ক্রেজ শূন্য বা ওল্ড স্কুলের কন্সার্ট আয়োজন করে গেছে একের পর এক। কিংবদন্তিতুল্য ম্যাক হক বা রেনেসাঁর নকীব খান, শিরোনামহীনের তুহিন যে রকম তার কাছের মানুষ তেমন রুকি ব্যান্ড চিৎকারকে পরিচয় করিয়ে দিতে কার্পণ্যতা নেই এতটুকু, আবার ব্যান্ড তীরন্দাজের ম্যানেজার সে। মেডিকেল স্টুডেন্ট হয়েও সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংএর খুঁটিনাটি বা রুপম ইসলাম সম্পাদিত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বাংলা রক ম্যাগাজিন' এ ওয়ারফেজকে নিয়ে রিভিউ লেখা- ইশতিয়াক আইটেম, টার্ম, প্রফের চাপে কিভাবে করে অবাক লাগে। মেডিকেলের দমবন্ধ গণ্ডির বাইরে ইশতিয়াকের এই PASSION আমাদের অনুপ্রাণিত করবে, খুব ছোট করে হলেও এ লেখার মাধ্যমে ছোটভাই ইশতিয়াককে ট্রিবিউট দেয়ার চেষ্টা। আশা রাখি ইশতিয়াক প্ল্যাটফর্ম এবং সকল মেডিকেল কলেজের যাত্রীদের নিজের মেডিকেল বাংলাদেশের কালচারাল মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মতো চমৎকার সব প্রোগ্রাম আয়োজনে সহায়তা করবে ।
(প্ল্যাটফর্ম কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার করেনা কিন্তু ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে পিছপা হয় না)

ডিমএমসি কুইজার্স ক্রনিক্যাল

রজত দাস গুপ্ত কে-৬৬

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জ্ঞান জিজ্ঞাসা প্রতিযোগিতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেকেন্ড রানার আপ হয়।
১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে জ্ঞান জিজ্ঞাসাঃ জাতীয় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মেডিকেল কলেজ দল। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন কে ৪০ ব্যাচের আবদুল হানিফ টাবলু স্যার। তিনি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। এছাড়াও ছিলেন কে ৪১ ব্যাচের প্রিন্স এবং কে ৪৩ ব্যাচের মুনির।
২০০৯,২০১১,২০১২,২০১৩ চার বছর ওয়ার্ল্ড কুইজিং চ্যাম্পিয়নশিপের বাংলাদেশ অধ্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এক ডাক্তার। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে ৬৪ ব্যাচের ছাত্র ডাঃ আহমেদ ফায়েজি তমাল।
২০০৮ সালে বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড কুইজিং চ্যাম্পিয়নশিপ যখন প্রথম চালু হয় তখনও চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে ৫৯ ব্যাচের ছাত্র ডাঃ রিফাত হায়দার।
২০১০ সালে ওয়ার্ল্ড কুইজিং চ্যাম্পিয়নশিপের বাংলাদেশ অধ্যায়ের রানার আপ ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে ৬৪ ব্যাচের ডাঃ শেখ মাহমুদ হাসান সাগর।
২০১১ সালে ওয়ার্ল্ড কুইজিং চ্যাম্পিয়নশিপের বাংলাদেশ অধ্যায়ের রানার আপ কে ৬৬ ব্যাচের রজত দাশগুপ্ত।
২০০৯ সালে ভিকারুননিসা নুন কলেজের চতুর্দশ বিজ্ঞান উৎসবে জ্ঞাতকালের প্রথম আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কুইজের আয়োজন করা হয়। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ। বিজয়ী দলের সদস্য ছিলেন কে ৬৪ ব্যাচের শেখ মাহমুদ হাসান সাগর এবং আহমেদ ফায়েজি তমাল। সাগর ভাই তমাল ভাই এর টিম মনে হয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের এ যাবত কালের সব থেকে সেরা টিম। এই কুইজে তৃতীয় হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের আরেকটি দল। কে ৬৪ ব্যাচের শাহরিয়ার রাজ্জাক মিমো এবং কে ৬৬ এর আরভি নাহার আশা ছিলেন সেই টিমের সদস্য।

আইইউটিতে ইন্টার ভার্সিটি কুইজ কম্পিটিশনে রানার আপ ডিএমসি দল।
কে-৬৬ এর মুশফিক রায়হান, আরভি নাহার আশা এবং ফয়সাল হক জিহান।
কয়েকদিন আগে IFIC Bank DQS-SSMC Carnival Captive 2013 এ ডিএমসি আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় কুইজে চ্যাম্পিয়ন হয়: কে ৬৬ ব্যাচের রজত দাশগুপ্ত, কে ৬৭ ব্যাচের ইমামুল মুত্তাসির এবং কে ৬৯ ব্যাচের হিসাম আব্দুল মাজেদ।
২৭ ডিসেম্বর, ২০১৩ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কুইজে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সেকেন্ড রানার আপ হয়েছে। প্রতিযোগীরা ছিলেন কে ৬৮ ব্যাচের নাদিয়া হোসেন, কে ৬৯ ব্যাচের সাদমান সৌমিক সরকার নিশম এবং কে ৭০ ব্যাচের তূর্য রহমান

শিল্পীঃ এস এম শরীফ উল কবীর চৌধুরী কে-৬৩, ডিএমসি

আঁধারে আলোর হাতছানি

অনুরাজ বিশ্বাস অভীক, সহযোগী সাধারণ সম্পাদক,ডিকিউএস, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

ফেইসবুকের একটা স্ট্যাটাস দিয়েই শুরু করি। "মেডিকেল স্টুডেন্টরা মরে গেলে পচে যায়; বেঁচে থাকলে পরীক্ষা দেয়.. সকালে বিকালে পরীক্ষা দেয়। আইটেম, কার্ড, টার্ম, সাপ্লি দেয়; তারপর আবার প্রফও দেয়!" চাপ,চাপ আর চাপ! মেডিকেলের এই চাপে চিড়ে চ্যাপ্টা জীবনে ডিবেট, কুইজ,ফটোগ্রাফীর মতো সৃজনশীল গুণগুলো ভাত পায় না। অথচ সারা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও মেধাবীরাই আসে এই মহৎ পেশায়। অনেকেই স্কুল কলেজে পড়া অবস্থায় তুখোড় বিতার্কিক বা কুইজার ছিলেন। কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার পরে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। কোথায় যেন হারিয়ে যায় এই মুখগুলো। কেন এমনটা হয়? এর সম্ভাব্য কারণ প্ল্যাটফর্মের অভাব। মেডিকেলে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এসব কর্মসূচীতে অংশ নেওয়া এক ধরণের বিলাসিতা। কারণ সহপাঠীরা যখন মোটা মোটা বইয়ে মুখ গুঁজে রাত ভোর করছে, তখন নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াটা খুব কষ্টকর। প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক সাহায্যের অভাবে এক সময় ডিবেট বা কুইজের স্টেজ কাঁপানো ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক ভাবেই তাই টেক্সট বইয়ের অদৃশ্য কারাগারের কয়েদী হয়ে পড়ে। হারিয়ে যায় কালের গর্ভে। ধূলি জমে সার্টিফিকেটগুলোয়। এটাই বাস্তবতা। ব্যতিক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার! এই ব্যতিক্রমের খোঁজেই মূলত 'ডিবেট এন্ড কুইজ সোসাইটি-এসএসএমসি'-এর পথচলা শুরু। বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। এখানে বিতর্কের চর্চা হয়ে আসছিল বহু আগে থেকে। অনেক তুখোড় বিতার্কিক এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে এসে কেমন যেন ভাটা পড়ে যায় এই চর্চায়। ধীরে ধীরে বিতর্কের জগত থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল এসএসএমসির নাম। হাতে গোনা কয়েকজন যারা নিজ উদ্যোগে ডিবেট করতেন, তাদের কাছে 'সলিমুল্লাহ মেডিকেল কোথায়?' বা 'এটা কি প্রাইভেট মেডিকেল?' জাতীয় প্রশ্ন ছিল খুবই পরিচিত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নিতেই মূলত একটি সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। বিতর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়মিত চর্চা বা নতুন প্রতিভা অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো সরকারি মেডিকেল কলেজে তৈরি করা রীতিমত চ্যালেঞ্জ। তবে সেই সুযোগ এসে গেল খুব আশ্চর্যভাবে। বলতে গেলে হঠাৎ করেই। কলেজে প্রায় ২২ বছর পর 'বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ' পালিত হল ২০১২ সালের অক্টোবরে। নতুন অধ্যক্ষ অধ্যাপক দিলীপ কুমার ধর ছাত্রদের পড়াশোনার পাশাপাশি এধরণের সৃষ্টিশীল কাজকেও উৎসাহিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাঁর আন্তরিক সম্মতি ও কুইজের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের অদম্য চেষ্টায় সলিমুল্লাহ মেডিকেলে প্রমবারের মত কুইজ প্রতিযোগিতা হল বিভিন্ন ব্যাচের মধ্যে। তাক লেগে গেল সবার। গ্যালারীভর্তি দর্শক হাঁ করে দেখলো কুইজিং মানে এখন শুধু 'বিসিএস গাইড' মুখস্ত করে ঘটাঘট কলিং বেল চাপা নয়। কুইজিং এখন অনেক পরিণত, অনেক আকর্ষণীয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এই সাড়া পড়ে যাওয়া দেখে আয়োজকদের মনে হল সময় এসেছে কিছু করে দেখানোর। অধ্যক্ষ স্যারের অনুমতি নিয়ে এবং ফার্মাকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ জালাল উদ্দিন ইকবাল স্যারের অনুপ্রেরণায় স্বপ্নীল, তানিম, সাকিব আর অনিন্দ্যরা দেখলো এক নতুন দিনের স্বপ্ন-সলিমুল্লাহ মেডিকেলকে পড়াশোনার পাশাপাশি বাইরের জগতেও বিখ্যাত করে তোলার স্বপ্ন, স্বপ্ন সলিমুল্লাহর ছাত্রছাত্রীদের উৎকর্ষ সাধনের। এ মহৎ উদ্যোগে তাদের সাথে যোগ দিল মাসাতো, মিনহাজ, সাবরি, শাওন, শাহিদা, ইমরান, আদনান, শুভ, অভীকের মত স্বপ্নবাজের দল। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই অবশেষে ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিতর্ক এবং কুইজকে এক কাতারে এনে স্থাপিত হল 'ডিবেট এন্ড কুইজ সোসাইটি-এসএসএমসি'। নামে ডিবেট আর কুইজ থাকলেও ক্লাব কিন্তু দশভুজা! মেডিকেল রিসার্চ ট্রেনিং,ফটোগ্রাফি, দেয়াল পত্রিকা,ভাষা প্রতিযোগিতা,বানান প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা-কী নেই এতে? আর এত কর্মসূচীর আশ্বাসেই আপাত নিষ্প্রাণ সলিমুল্লাহর ক্যাম্পাসে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। মাত্র ৫ দিনে ৪৫০ জন সদস্য নিয়ে 'ডিকিউএস' তখন এক নতুন চেতনা।
আর সেই চেতনার মূর্ত প্রতীক হয়ে রইল বছরজুড়ে ডিকিউএস এর নানা কর্মকাণ্ড। এক নজরে দেখে নেয়া যাক পুরো বছরজুড়ে ডিকিউএস এর ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনগুলো, জানুয়ারি: ৩১ তারিখে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। ৫ দিনে ৪৫০ জন রেজিস্টার্ড সদস্য সংগ্রহ। ফেব্রুয়ারি: (১) Inaugural Program-আন্তঃব্যাচ কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। ৩৮ তম ব্যাচ এতে চ্যাম্পিয়ন হয়, কুইজ মাস্টার ছিলেন ডাক্তার আবদুন নূর তুষার , কুইজের পর ছিল একটি রম্য বিতর্ক। (২) একুশ স্মরণে দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা। ২৩ টি দেয়াল পত্রিকা জমা পড়ে। বিচারকার্যে ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর দিলীপ কুমার ধর, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর এ জেড এম সাখাওয়াত হোসেন, পেডিয়াট্রিকস বিভাগের প্রফেসর ইফফাত আরা শামসাদ, ফার্মাকোলজি বিভাগের ডাক্তার জালালউদ্দিন ইকবাল, এনাটমি বিভাগের ডাক্তার জাহাঙ্গীর আলম এবং মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার রনজিৎ সেন চৌধুরী। (৩) শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় ভাষা প্রতিযোগিতা। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. জিনাত ইমতিয়াজ আলী. এপ্রিলঃ (১) Public Speaking Competition (২) Workshop on Communication Skill by Dr. Tasdik Hasan Dip & Dr. Rhedeya Nury Nodi. (৩) সনাতনী বিতর্ক বিষয়ক কর্মশালা, পরিচালনা করেন- খন্দকার ওয়াহেদুর রহমান সৌরভ। (৪) অন্তঃব্যাচ বিতর্ক প্রতিযোগিতা (৪১তম ব্যাচ) (৫) আন্তঃব্যাচ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা। বিজয়ী ৩৭ তম ব্যাচ। মেঃ ১২ মে ডিকিউএস এর কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গোপন ভোটের মাধ্যমে ১৮ জন নির্বাচিত হন ১ বছরের জন্য। জুনঃ দেশের প্রথম মেডিকেল অলিম্পিয়াড। বিষয় এনাটমি। সেপ্টেম্বরঃ (১) ডিকিউএস এর প্রথম নিউজলেটার 'অলিগলি' প্রকাশ। (২) আন্তঃস্কুল কুইজ প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল। (৩) আন্তঃকলেজ কুইজ প্রতিযোগিতা। (৪) আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ বারোয়ারি বিতর্ক। (৫) ফটোগ্রাফি কর্মশালা। পরিচালনা করেন আরেফিন হিমেল এবং কুন্তল ব্লেজ ডি কস্তা।

নভেম্বরঃ কার্নিভাল ক্যাপ্টিভ ২০১৩। ইভেন্ট সমূহ- (১) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা- ২৪ টি দলকে পেছনে ফেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জয়ী। (২) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কুইজ প্রতিযোগিতা- ৫৬ টি দলের মধ্যে বিজয়ী ঢাকা মেডিকেল কলেজ। কুইজমাস্টার হিসেবে ছিলেন কুইজার্স বাংলাদেশের শায়েখ হাসান এবং সুহান রিজওয়ান। (৩) মেডিস্পেল- বিশ্বের প্রথম মেডিস্পেলে অংশগ্রহণ করে ৮৮ টি দল। বিজয়ী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। প্রথম স্পেলমাস্টার আইসিডিডিআর,বি এর ডাক্তার বুশরা জারিন। (৪) দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা- বিজয়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়(অর্থনীতি) (৫) পোস্টার প্রতিযোগিতা- বিজয়ী ঢাকা মেডিকেল কলেজ (৬) মেডিকেল অলিম্পিয়াড। প্রথম প্রফে বিজয়ী এসএসএমসি, দ্বিতীয় প্রফে ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ। (৭) ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা (মোবাইল, পিএনএস এবং ডিএসএলআর ক্যাটেগরি)। বিচারক ছিলেন সাব্বির ফেরদৌস, দর্শন চাকমা এবং ফয়সাল আকরাম ইথার।
(৮) Extempore Speech Competition (৯) চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা (১০) Emergency Medicine Workshop- ২৫৪ জন অংশগ্রহণ করে। পরিচালনা করেন ডাক্তার তাসদিক হাসান এবং MOVER.
কার্নিভাল ক্যাপ্টিভের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি চেয়ারম্যান এডভোকেট সুলতানা কামাল। ডিসেম্বরঃ (১) ডিকিউএস এর প্রথম ইংরেজি নিউজলেটার LubDub প্রকাশনা। (২) অস্তিত্বে একাত্তর!- এ অনুষ্ঠানে শহীদ ডাক্তার আবদুল আলীম চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের প্রতি ডিকিউএস-এসএসএমসি এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেন ডাক্তার নুজহাত চৌধুরী। এর পাশাপাশি এসএসএমসি, ডিএমসি, বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে ছিল একটি ভিন্ন মাত্রার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠার এক বছরেই ডিকিউএস পেয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত ২১তম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কের সনাতন ও সংসদীয় উভয় বিতর্কেই চ্যাম্পিয়ন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হওয়ার গৌরবও তাদেরই। কুইজেও দেখা মিলেছে সাফল্যের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ আয়োজিত পৃথক দুটি কুইজ প্রতিযোগিতার গর্বিত বিজয়ী ডিকিউএস। এছাড়া বিটিভির কুইজ কুইজ অনুষ্ঠানে ডিকিউএস এর নবীন কুইজাররা নিয়মিতই বিজয় ছিনিয়ে আনছে। যাত্রার শুরুটা বেশ ভালই হয়েছে। এবার প্রয়োজন এই অর্জন এই চেতনাকে ধরে রাখা, দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়া। ডিবেট শাখার সভাপতি স্বপ্নীল ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন,"স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এ মার্জিত ও সুন্দর গুণাবলীর চর্চার জন্যই মূলত DQS এর সৃষ্টি, বিতর্ক প্রতিযোগীতা, বিভিন্ন বিষয়ে কুইজ, দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা, মেডিকেল অলিম্পিয়াড ও photography প্রতিযোগিতা আয়োজন ও অংশগ্রহন করা ছাড়া ও বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক ও রুচিশীল কর্মকান্ডকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল ও পরিশীলিত মানসিকতার বিকাশ ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য আমাদের এ কার্যক্রম শুধু আমাদের মেডিকেল এ সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ও ছড়িয়ে পড়ুক এই আশাবাদ ব্যাক্ত করি.." একই প্রসঙ্গে কুইজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিন্দ্য বলেন, " ডাক্তার মানেই প্রেসক্রিপশন লেখার যন্ত্র- এ ধারণা পালটে দিতে চাই। ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করবে, দেশ ও দশের খবর রাখবে, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিজের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখবে, ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুনভাবে জাগ্রত করবে- তা না হলে ডাক্তারকে কোন মানুষ সমাজে 'Better Human Being' হিসাবে গণ্য করবে। আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ আমাদের এই নতুন সংগঠন ডিকিউএস। আশা করি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের আরও ২০ টি মেডিকেলে এমন ২০ টি সংগঠন তৈরি হবে এবং সৃজনশীল ডাক্তার গড়ে তোলার কাজ শুরু করবে; যাদের 'কসাই' বলার আগে মানুষ অন্তত ১০ বার চিন্তা করবে!"

২১ তম জাতীয় টেলিভিশন বির্তক প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ন এসএসএমসির রেজওয়ান শুভ, তাহসিন মাহমুদ সাদমান, সাকিব মাহমুদ বনাম রানারআপ এসবিএমসির আসিফ উদ্দিন খান, মোরশেদা জাহান মিতু, তরিকুল ইসলাম শিশির।

ফাইনাল প্রফ

মরে গেলে পঁচে যায়

নূর এ সরোয়ার সৈকত,৫০তম ব্যাচ, ময়মনসিংহ এমসি

মানুষ মরে গেলে পঁচে যায় ।
বেঁচে থাকলে কিছু মানুষ মেডিকেলে ভর্তি হয় ।
অতপর.....
প্রতিদিন দুই/চারটি আইটেম দেয় ।
আইটেমে কারনে অকারণে পেন্ডিং খায় ।
মাসে মাসে কার্ড/টার্ম পরীক্ষা দেয় ।
কেউ পাস করে, কেউবা সাপ্লি খায় ।
অতপর আবারও পরীক্ষা দেয় , এবং রি সাপ্লি খায় ।
তিনটা ভয়ঙ্কর প্রফ পরীক্ষা দেয় ।
পরীক্ষার ফলাফলে কেউ কাঁদে, কেউবা হাসে, কেউ বা হয় ডাক্তার

প্ল্যাটফর্মে বইসা ভাবি-১

ডাঃ সেলিম শাহেদ,৩০তম ব্যাচ,শেরে বাংলা এমসি(বরিশাল),আইএমও মেডিসিন,স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

যারা ভাবছেন পড়াশোনা হয় নাই। সামনের চান্দে 'পইড়া' প্রফ দিমু।
ব্যাগ তো গোছানোই আছে। বাসায় চলে যাই।
তাদের বলবো,
'জনাব,যাওয়ার আগে কিছু ফেলে গেলেন কী ?'
'না, আমার ডিসিশন ফাইনাল।এই ভাবে 'চুদুর বুদুর' করে প্রফের মতো এত বড়ো একটা পরীক্ষা দেয়ার কোনো মানে হয় না'।
আমি বলবো যাওয়ার আগে বিরাট একটা 'বাই চান্স' ফেলে যাচ্ছেন। ধরেন, আপনি প্রফে স্যারদের সামনে লং-কেস দিচ্ছেন,এমন সময় এক্সটার্নাল এর সেল-ফোন টা বেজে উঠলো...পু পু... ইন্টারনালের বদান্যতায় আপনি 'বাই-চান্স' পাশও করে যেতে পারেন। ধরেন লং ভাইভাতে বসেছেন, মনে মনে ভাবছেন কিছুই তো পারি না। ধ্যাত! অমনি,মিন্টুর দোকানের সিংগাড়া খেয়ে পেট মোচড় দিয়ে উঠলো বোর্ডের খিটমিটে ফেল করানোয় ওস্তাদ 'পিংকু' স্যারের। আর যায় কোথায় স্যারও বাথরুমে গেলো আপনার জবানও খুলে গেল।

জানেন তো অনেক পরহেযগার বান্দা আছেন যারা প্রফের আগে স্বপ্নে কোশচেন পান। তাদের স্বপ্নে পাওয়া অস-পির কয়েকটা যদি আপনাকে 'ছদকায়ে জারিয়া' হিসেবে দেয়, তবে আপনার কপাল খুলেও যেতে পারে।মনে রাখবেন প্রফের আগে ক্যাম্পাসে অনেক সম্ভাবনা ঘোরাফেরা করে। এদের গতি-বিধি সতর্ক খেয়াল রাখুন। ভুলেও ক্যাম্পাস ত্যাগ করবেন না।
প্রফের এই ভরা মৌসুমে একা থাকবেন না।
দল বেঁধে থাকুন। হতাশা গ্রাস করতে পারবে না।
বাড়ি যাওয়ার সিংগেল চিন্তা চাগাড় দিতে পারবে না।

সবশেষে বলবো 'বাই চান্স'টাকে এভাবে হেলায় ফেলে যাবেন না।
প্রফ পরীক্ষা দেয়ার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হলো 'হ্যা-ডম'।
নার্ভ শক্ত রাখার হ্যা-ডম না থাকলে পরের টার্মেও হবে না।
যারা ভাবছেন কিছুই পড়া হয়নি তাদের বলবো 'বাই চান্সকে বিশ্বাস করুন' পাশ হয়ে যাবে।এ পড়া শেষ হবার নয়। যা পড়েছেন 'ও তেই হবে'।

তোমরা যারা সদ্য ডাক্তারি পাশ করেছো

এম আমির হোসেন,৩৮তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি,নিউরোলজি বিভাগ,বিএসএমএমইউ ।

তোমরা যারা সদ্য ডাক্তারি পাশ করেছো তারা আমার প্রায় দশ বছর জুনিয়র। দশ বছর আগে জন্মানোর অধিকারটুকু নিয়ে আমি তোমাদেরকে 'তুমি' করেই লিখছি। জীবনের এই প্রান্তে এসে তোমরা এখন ভাবছো, ছাত্র জীবনে তো বেশ ভালোই ছিলে; কোন ভাবনা ছিলো না, জীবন-জীবিকা নিয়ে ভাবতে হয় নি। কিন্তু এখন নানান ভাবনা তোমাদের মাঝে দানা বাঁধছে। সামনে কী করবে, কীভাবে করবে, ক্যামন করে এগুলে ভালো হবে এইসব নানান ভাবনা তোমাদের মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে। দেশে থাকবে নাকি দেশের বাইরে চলে যাবে, বিয়ে-শাদি কখন করবে, জীবন সঙ্গী কী ডাক্তার হবে নাকি অন্য পেশার হবে এই ভাবনাগুলো তোমাদের মনে আঁতিপাঁতি করছে। কোন ধরণের চাকরি নিলে ভালো হয়, ঢাকার ক্লিনিক নাকি পেরিফেরির ক্লিনিক, এনজিও চাকরি নাকি মেডিসিন কোম্পানির ম্যানেজারিয়াল চাকরি, কোন বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন করবে, সরকারি বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে কিনা ইত্যাদি। ভাবছো, ডাক্তারি পড়ে ভুল করে ফেলছো কিনা? যেখানে তোমার অন্য অডাক্তার বন্ধুগণ চাকরি-বাকরি শুরু করে কর্ম জীবন শুরু করে দিয়েছে সেখানে তোমাকে চাকরি-বাকরির পাশাপাশি ক্যারিয়ার করার জন্য আরও বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। এ ব্যাপারে মনে রাখবে, মানুষের সম্ভাবনা ক্রমশ সংকুচিত হয়। জন্মের পর তোমার ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দারোয়ান কিংবা উকিল হবার সমান সম্ভাবনা ছিল। এখন শুধুমাত্র ডাক্তারি ছাড়া আর অন্য কিছু করা অসম্ভব তোমার জন্যে। তাই সুখী হতে হলে বর্তমানকেই বেশি ভালোবাসতে হবে। 'কী হলে কী হতে পারতে' এটা ভাবা বিরাট বোকামি। এই পথে যখন চলেই এসেছো, যুদ্ধটা শেষ করেই তবে থামো। প্রথমে চিন্তা করো, দেশে থাকবে কিনা? যদি না থাকতে চাও, তবে কোথায় যাবে আগেই চিন্তা করে নাও। জীবনের প্রথমে টাকা কামানোর জন্য মধ্যপ্রাচ্য ভালো হবে। কিছু টাকা কামিয়ে উন্নত দেশগুলোর রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর সেখানে মাইগ্রেট করতে পারো।

এ ব্যাপারে বর্তমানে ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে পারো। উল্লেখ্য যে, রয়েল কলেজ অব লন্ডনের এমআরসিপি, এমআরসিএস ইত্যাদি পরীক্ষার কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রয়েছে। সে ভাবেও ক্যারিয়ার এগিয়ে নিতে পারো। শুরুতে উন্নত দেশগুলোতেও চলে যেতে পারো। কম্পিউটার বেজড রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা অনেকগুলোই বাংলাদেশের প্রোমেট্রিক সেন্টারগুলোতে হয়। গুগোল এ যেয়ে একটা সার্চ দিলেই নিয়ম-কানুন সব পেয়ে যাবে। এছাড়া মালয়েশিয়াও ভালো বিকল্প হতে পারে। সেখানে মাঝে মাঝে সরকারি ও বেসরকারিভাবে ডাক্তার নিয়ে থাকে। ইন্টারনেট লাইনসহ মোবাইল ইউজ করো, চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। আর তোমার যদি 'মরি-বাঁচি দেশেই থাকবো' এই অবস্থা হয় তবে আমি তোমাকে সাধুবাদ জানাবো। এই শীতলক্ষ্যা-মেঘনা-কর্ণফুলি-তিতাসের ঘ্রাণ, অসহায় মানুষের ভালোবাসা তোমাকে অন্য রকম কিছু অনুভূতি দেবে যা তুমি স্বর্গেও পাবেনা। জানি, এখানে সমস্যা অনেক, তবুও এ তোমার দেশ, তোমার পুণ্যভূমি। তোমার ইচ্ছার জন্য তোমাকে স্যালুট জানাই।

এবার কাজের কথায় আসি। প্রথমেই ঠিক করে নাও কোন বিষয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন করবে। ক্লিনিক্যাল না বেসিক সাবজেক্টে? মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি না পেডিয়াট্রিক্সে? নানা জন তোমাকে নানান কথা বলবে। তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। ইনার থার্স্ট, মেরিট ও স্ট্যামিনা অ্যাসেসমেন্ট করে সিদ্ধান্ত নিও। বিগত এমবিবিএস লাইফে তোমার যে বিষয়টি ভালো লেগেছে সে বিষয় নিয়েই এগিয়ে যেতে পারো। বেসিক সাবজেক্টে পড়াও বুদ্ধিমানের কাজ। এখানে মেধাবীরা আসলে খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে। এই স্টেজে তোমাকে পার্ট-টাইম জব করতে হবে, যদি বিসিএস দাও (আমি সরকারি চাকরিকেই উত্তম মনে করি) তার প্রিপারেশনও নিতে হবে এবং তোমার প্রিয় সাবজেক্টে পার্ট-১/ভর্তি পরীক্ষা পাশের জন্য পড়তে হবে। যতো দ্রুত পাশ করবে ততোই মঙ্গল। তারপর খুব দ্রুত বিষয়ের প্রয়োজন মতো ট্রেনিং শুরু করে দিতে হবে। পাশাপাশি খরচ চালানোর জন্য পার্ট-টাইম জব করতে হবে কিংবা জিপিও করতে পারো। এই স্টেজে কিছু হাতের কাজ যেমন, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ছোট-খাটো সার্জারি, ইন্ট্রা-আর্টিকুলার ইনজেকশন ইত্যাদি শিখে নিতে পারো যা তোমাকে প্র্যাকটিসে হেলপ করবে।

বিসিএস এ নির্বাচিত হয়ে গেলে কিংবা ট্রেনিং মাঝামাঝি চলে আসলে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পারো। দেরিতে বিয়ে করা একটি ভুল সিদ্ধান্ত। একই পেশাতে বিয়ে করাই সর্বোত্তম। তাহলে দুজন মিলে ক্যারিয়ারের পাশাপাশি কিছু একটা করে চলতে পারবে। তবে বিবাহের ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদার মিল ও মানসিক মিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আবেগের বশে হুট করে বিয়ে করা কিংবা ক্যারিয়ার নির্বাচন করা অনুচিত। এতে পরে পস্তানোর সম্ভাবনাই বেশি থাকে। তোমার যদি সরকারি চাকরি হয়ে যায় তবে প্রথমবারের মতো তোমাকে সব ছেড়ে বহু দূরে চলে যেতে হবে। কোন একটি উপজেলায় তোমার প্রথম পদায়ন হবে। খুব একাকী হয়ে যাবে তুমি। যে জগতের সাথে তুমি পরিচিত তা থেকে এ জগত সম্পূর্ণ আলাদা। এ বিষয়টাকে চাইলে এনজয়ও করা যায়, মানুষের প্রত্যক্ষ সেবা করার সুযোগ পেলে। নানান ধরণের মানুষের সাথে মিশতে হবে তোমাকে। তুমি তখন প্র্যাকটিস করে কিছু টাকা জমাতে পারো। টাকার নেশায় তোমার ক্যারিয়ার ভুলে যেও না। তাহলে পরে ভুগতে হবে। চেষ্টা করবে তোমার বিষয়ে যেখানে ট্রেনিং কাউন্ট হয় সেখানে পোষ্টিং নিতে। ডিজি অফিসে কোথায় যেতে হবে, কাকে ধরতে হবে খুব দ্রুতই তোমাকে জেনে নিতে হবে। অটোমেটিক কিছুই সরকারি চাকুরিতে হয় না। তোমারটা তোমাকেই আদায় করে নিতে হবে। এই চেষ্টা-তদবিরের ব্যাপারটি বিরক্তিকর। কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে এই বিরক্তিকর কাজটি বিনা বাক্যে গলাধঃকরণ করতে হবে। মন খারাপ করে হুট করে চাকরিটা ছেড়ে দিও না। পরে আক্ষেপ জন্মাতে পারে। তবে বুঝে-শুনে ছাড়লে সে আলাদা কথা! আসলে পৃথিবীতে 'প্রকৃত সুখের চাকরি' কোথাও নেই এটাই বাস্তবতা।

প্রয়োজনীয় ট্রেনিং শেষ হলে খুব দ্রুতই কোর্সে চলে আসবে। লম্বা কোর্সগুলো এ ক্ষেত্রে ভালো। এখানে লম্বা সময় ডেপুটেশনে থেকে ফেলোশিপ/মেম্বারশিপ পরীক্ষাগুলো দিতে পারবে। হাতে কিছু টাকা থাকলে এমআরসিপি/এমআরসিএস ইত্যাদি পরীক্ষাগুলোও দিতে পারো। আদতে লস হবে না।

এ দেশের প্রতিটা পদে পদে নানা অনিয়ম আছে। তা তুমি একা ভাঙ্গতে পারবে না। এই সিস্টেমে থেকেই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। তারপর তুমিই প্রথম অনিয়ম ভাঙ্গার সবল কণ্ঠ হয়ো। পূর্ববর্তী প্রজন্মকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তাঁরা শুরু করে দিয়ে গেছেন, তোমরা সেটা গ্রহণ করবে। তারপর যেই জিনিসটা তোমাকে পীড়া দিয়েছিলো সেই জিনিসটাকে ভাঙ্গার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

তোমার দৃষ্টি হবে প্রগতির পথে, দেশের অগ্রগতির পথে। এই সত্তর বছর গড় আয়ুর জীবনে খুব বেশি লাভ করার মতো কিছু নেই। দেশের জন্য, অগ্রগতির জন্য, তোমার পরিবারের জন্য যতোটুকু করতে পারবে সেটাই তোমার আসল করা। বাকি সব কিছু ফেক, বাকি সব কিছু ফাউল। কয়েক প্রজন্ম শিক্ষার মধ্য দিয়ে গেলেই একটি জাতি জাতে উঠতে পারে। মনে রাখবে, এই দলান্ধতা, মতান্ধতা ও ধর্মান্ধতায় বেশি কিছু অর্জন নেই। সহজ আবেগ, মেধা ও সঠিক পরিকল্পনাই তোমার আসল সম্পদ।
তুমি এগিয়ে যাও, হে আগামীর সৈনিক!

যোদ্ধা অথবা ডাক্তার

ট্রেইনিং

ডাঃ সুমন চৌধুরি, ৪১তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি,৩৩তম বিসিএস
এফসিপিএস শেষ পর্ব পরীক্ষার্থী (মেডিসিন)

আমার এই লেখা সদ্য ডাক্তার থেকে শুরু করে নবাগত প্রশিক্ষণার্থীর (বিশেষ করে, মেডিসিন এর) উদ্দেশ্যে। সেটা অনারারী হোক, বা বিসিএস করে এসে সরকারীভাবে হোক- একজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার কিন্তু সবার চাইতে এগিয়ে থাকে। কারণ, দিন শেষে রোগীর রোগ নির্ণয় আর তাকে সারিয়ে (শারিরিক/মানসিক) তোলাটাই আসল!

এফ সি পি এস পার্ট ১, এমডি পার্ট ১, এমআরসিপি (পার্ট ২ লিখিতসহ) প্রভৃতি পরীক্ষায় কিন্তু একদিনও ট্রেইনিং লাগেনা। এমনকি, এমসিপিএস পরীক্ষা কেবলমাত্র এক বছর প্রশিক্ষণ দেখিয়েই পাশ করা যায়। আবার, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক ডি-কার্ডধারীদের কেবলমাত্র ECG Interpretation এর জন্য গোপনে এমবিবিএস বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হয়! মনে রাখতে হবে, বিচার কিন্তু নিজেকেই করতে হবে। একটা রুগীকে কোন এক বড় কনসালটেন্ট একটা ডায়াগনোসিস করে গেছে দেখে, আমিও হুবহু তাই বলে আসব, তা হবেনা। কারণ, (যদি আমি ওই রোগীকে দেখার সুযোগ পাই) আমার নিজের সিদ্ধান্ত আমার নিজের Physical examination, History and Proper Data Interpretation এর উপর নিতে হবে। একজন Liver palpable বলে গেছে, কাজেই আমিও বলে ফেললাম, একজন USG রিপোর্টে Spleen Enlarged দেখে উচ্চকণ্ঠ, তা দেখে পেটে হাত দিয়ে আমিও বলে ফেললাম, এই যে spleen, পেয়ে গেছি তা, হবেনা! নিজের প্রশিক্ষণ কারো কোন কালে অন্য কেউ এসে করে দিয়ে যেতে পারবে না। ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ নিতে ব্যর্থ হলে, রোগী চোখের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকার পরও আমরা তার রহস্য (মানে ডায়াগনোসিস) উদঘাটন করতে পারব না।
সব কিছু বইতে লেখা থাকেনা,আর ওগুলোতে বেশীরভাগ থাকে ইউরোপ-আমেরিকার কথা (সঙ্গত কারণে)। কাজেই খুব খারাপ অবস্থায় ওয়ার্ডে আসা একটা রোগী সেবা পেয়ে চোখের সামনে দিন দিন কি করে ভালো হয়ে উঠছে লেখা থাকেনা, কিংবা, প্রথম দিনে রোগী/রোগীর লোকের ব্যবহার কিভাবে ৩য় দিনে পাল্টে যায়, তার কথাও লেখা থাকেনা। এইসব কেবলমাত্র ট্রেইনিং এ জানা সম্ভব! তাছাড়া, স্থানীয় সীমিত লোকবল, সম্পদ, আর কিছুটা Adapted চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর আরোগ্য লাভের কথা লেখা থাকেনা টেক্সট বইয়ে! কেবলমাত্র নিখুঁত (সেই সাথে অতি দ্রুত)Data Interpretation ই একজন ভালো Clinician গড়ে তুলতে পারে না। "We should treat the patient, not the report!" এই বিখ্যাত কথাটি তখন আবার ঘুরে ফিরে আসবে।

তাহলে কি করতে হবে?
একদিন ও সময় নষ্ট না করে প্রশিক্ষণ এ ফিরে যেতে হবে। কারণ, এই সুযোগ বার বার আসেনা, একইভাবে আসেনা। একমাস প্রশিক্ষণও আমাদেরকে অন্য (যে করেই নাই) আরেকজন থেকে এগিয়ে রাখবে। প্রশিক্ষণ মানে কিন্তু অভিজ্ঞতাও। কখনোই বই আর Internet ঘেঁটে অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব নয়, যেটা সম্ভব তা হল কয়েকটা Cause/Complications বেশি জানা। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে Patient management এর অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেকেই Acute Pulmonary edema এর Pathophysiology, আর বেশ কয়েকটা Cause জানা থাকা সত্ত্বেও হিমসিম খেতে দেখা যায়! এটা আসলে জঙ্গলে কি আছে তা জানার চাইতেও, সেই জঙ্গলে একবার অভিযান করে দেখার মত। কাজেই, প্রতিনয়ত শিখতে হবে, এবং দ্রুত শিখতে হবে। এক ভুল ২য় বার করা যাবেনা। কারণ, আমার মতে, মানুষ মাত্র ভুল হলেও, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা অপরাধ!

প্রশিক্ষণ চলাকালে আমাদের নানা দিক দিয়ে, নানাভাবে ক্রমাগত নানা তথ্য আসতে থাকবে, নিজের মাঝে ঢুকতেও থাকবে। কিন্তু, নিজেকে অবশ্যই প্রাপ্ত তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করে নিতে হবে(প্রয়োজনে রোগীর সাথে বেশি সময় ব্যয় করে হলেও) ! কোন এক বড় ভাই, আপা একটা তথ্য দিলেই যে তা সর্বজনীন তা নয় কিন্তু! রোগীভেদে একই রোগ বিভিন্নভাবে হাজির হয়।

ডাক্তারি বিদ্যা অনেকটা সংগীতের মত গুরুমুখী বিদ্যা। এখানেই অগ্রজ, শিক্ষক সবাই গুরু। সবার কাছ থেকেই শিখতে হবে। কারন, অগ্রজদের কেউ Counselling ভালো করে বা বুঝে, কেউ Data Interpretation দ্রুত বা ভাল করে, কেউ বা Attendent management, Sister-word boy control পারদর্শী !
গুরুমুখী বিদ্যার কারনেই রোগীর Investigation, Examination, Diagnosis , Treatment এর প্রতিটি ধাপেই সঙ্গীতের নানান ওস্তাদের মত নানান ঘরানারও সূত্রপাত ঘটে। এই কারণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক আজিজুল কাহার এর ঘরানা আবার চট্টগ্রামের সহযোগী অধ্যাপক এম এ হাসান এর ঘরানার অনুরূপ নয়, বরং স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যময়! আমাদেরও এই বিচিত্রের স্বাদ (যতটুকু পারা যায়) নিতে হবে, বা নেওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে! এই দিক দিয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি এই কারণে যে, একই রোগে আক্রান্ত হয়ে আসা সমাজের একেবারে নিচু স্তরের (অর্থনৈতিকভাবে) রুগী থেকে শুরু করে বিদেশ ফেরত অনেক উচু স্তরের রুগীর চিকিৎসা দেয়া, ফলোআপ, ভর্তি দেখার সুযোগ হয়েছে!

প্রশিক্ষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, Diagnosis through PATTERN RECOGNITION!
Clinical Reasoning এর অন্যতম স্তম্ভ হল এই PATTERN RECOGNITION ব্যাপারটা সহজ কথায় বললে বোঝায়, একই রকম উপস্থিতি অন্য আরেকটি রোগীর মাঝখানে খুঁজে পাওয়া! এই গুণকে (PATTERN RECOGNITION) কে কাজে লাগিয়েই আমরা সহজে বলে দেই (যখন পাশের বাসার কেউ ডেকে নিয়ে যায়) "আঙ্কেল, আপনার Dengue হয়েছে"! আর, সেই কারণেই দেখা যায়, শহরের বিখ্যাত Clinician প্রাইভেট হাসপাতালের কেবিনে রোগী দেখতে ঢুকেন, হাতে ব্লাড প্রেশার মেশিন ও বাঁধেন, কিন্তু যাওয়ার আগে ডিউটি ডাক্তারকে বলে যান, "উনার তো Stage 4 Bronchial Carcinoma, ইয়ে এক কাজ কর, CT of Head করে ফেলোতো"। আর আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি !

আসলে, অভিজ্ঞতা আর প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই, এই কথাটা বোঝাতেই এতো কথা! কাজেই, কেবলমাত্র কিছু টেক্সট বই আর ইন্টারনেটের মাঝে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে, সময় নষ্ট করা যাবেনা! কখন পার্ট ১ হল, কখন হল না তা নিয়ে চিন্তার বেশি কিছু নাই, আর, অনারারী বা সরকারী এইসব ভাবারও সময় নাই। উন্নত বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় যেখানে টাকা দিয়ে (পরীক্ষা পাশ মানেই তো টাকা খরচ) রোগীর গায়ে হাত দিতে হয়, মাসের পর মাস প্রশিক্ষণ তো দূরের কথা! সেখানে, বিনা খরচে, কয়েকবছর এত বৈচিত্র্যময় রুগীর সান্নিধ্য লাভ অকল্পনীয় বটে ।
প্রশিক্ষণে চৌকষ আর পারদর্শী হলে সবাই বুঝবে, কার মাঝে কি আছে! তখন পার্ট ১ পাশ সময়ের ব্যপার মাত্র। হোক না তা ২য় বা ৩য় বার। কিন্তু, প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা!

অনেককে দেখে, অনেকের সাথে আলাপ করে, এটা বুঝতে পেরেছি যে, পোস্ট গ্রাজুয়েশন পাশ একটা ওয়ান ডে গেম। ওইদিন ভালো করলে পাশ, নেহাত না করলে ফেল, আর বেশি কিছু তো না! তো??
ফেল মানেই এই নয় যে, সমস্ত প্রশিক্ষণ বৃথা, ভুল!

তাইলে ডিগ্রী কেন?
সেটাও ভেবে (আর অন্যদের সাথে আলাপ করে) বুঝলাম, আসলে, ঐটা বেশি দরকার তাদের দেখানোর জন্য, যারা ডাক্তার না (মানে, সমাজের অন্য শ্রেণীর লোক, আমজনতা)! যারা জানতে চাইবেনা, আপনার অভিজ্ঞতা আর প্রশিক্ষণ কেমন? তারা দেখবে, নামের শেষে যা চাই ঐটা আছে কিনা!

এমডি রেসিডেন্সি বনাম নন রেসিডেন্সি

ডাঃ কাজী মুনিরুল ইসলাম,৩৬তম ব্যাচ, শেরে বাংলা এমসি(বরিশাল),নিউরোলজি এমডি পার্ট ওয়ান, ঢাকা এমসি

বাংলদেশে যে কয়টা পোস্টগ্রাজুয়েসন সিস্টেম আছে তার মধ্যে MD /MS একটা সিস্টেম। গত ৪-৫ বছর আগে এমডি/এমএস এর যে সিস্টেম ছিলো তা শুধুই MD /MS। কিন্তু প্রাণ গোপাল স্যার ভিসি হওয়ার পরে বিদেশের আদলে একটা পোস্টগ্রাজুয়েশন সিস্টেম করলেন নাম হলো রেসিডেন্সি। যেহেতু আগে একটা MD/MS সিস্টেম ছিলো তাই সেটার নাম হয়ে গেলো ননরেসিডেন্সি ।

রেসিডেন্সিঃ ২০১৩ সালের পুর্বে শুধু BSMMU তেই রেসিডেন্সি ছিলো । ২০১৩ সাল থেকে আরো অনেক মেডিকেলে রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম চালু হয়েছে । রেসিডেন্সি হলো-একজন স্টুডেন্ট একটা ইনিস্টিটিউটে কোন একজন প্রফেসরের আন্ডারে কাজ করবেন,কোর্স শেষে একটা পরীক্ষা নিয়ে স্টুডেন্টকে ঐ বিষয়ে স্পেশালিস্ট হিসেবে সার্টিফিকেট দেয়া হবে (বাংলাদেশে এই ডেফিনেশনর চেঞ্জ করা হয়েছে)। আমাদের রেসিডেন্সি কোর্স ৫বছর, যে ইন্সটিটিউটে চান্স পাবে স্টুডেন্টকে ঐ ইনিস্টিটিউটে ৫বছর থাকতে হবে। নন বিসিএসদের BSMMU থেকে মাস শেষে ভাতা দেয়। অন্য ইনিস্টিটিউট দিবে কিনা নিশ্চিত না। দুইটা পার্ট phase A 2 বছর, phase B 3 বছর ।

ননরেসিডেন্সিঃ আমাদের সিএ , রেজিস্ট্রারাগণ যে এমডি/এম এস করছেন তা নন রেসিডেন্সি । নন রেসিডেন্সি কোর্স ৫ বছর । ননরেসিডেন্সির কয়েকটা পার্টঃ পার্ট১ কোর্স ৬ মাস,ট্রেইনিং ২ বছর,পার্ট২ কোর্স ৬ মাস,পার্ট৩ বা থিসিস পার্ট-২ বছর পার্ট১ বেসিক পার্টে আছে Anatomy, physiology, Biochemistry, Pathology, microbiology,pharmacology.

রেসিডেন্সির সুবিধাঃ মাস শেষে টাকা পাওয়া যায় । ৫ বছর এক জায়গায় থাকা যায়। ডিগ্রী কম্পলিট হবে আশা করা যায়। বেসিক পার্ট বলতে কিছু নাই ।
আসুবিধাঃ পূর্বের ট্রেনিং কাজে লাগেনা । আবার ৫ বছর এক জায়গায় থাকতে হয় । FCPS করা থাকলে রেসিডেন্সির ট্রেনিং কাজে লাগবেনা (রেসিডেন্সিতে কোন ট্রেনিং সার্টিফিকেট দেয়া হয় না)।
নন রেসিডেন্সির সুবিধাঃ ইচ্ছে মত যেখানে খুশি ট্রেনিং করা যায় । পুর্বের ট্রেইনিং কাজে লাগে । FCPS, MD একসাথে করা যায় । ৫ বছর একজায়গায় থাকা লাগেনা ।
অসুবিধা : বেসিক পার্ট । ডিগ্রি আদৌ কমপ্লিট হবে কিনা আল্লাহ জানেন। বিসিএস না থাকলে বিনা বেতনে অনারারী ট্রেনিং করা লাগে ।
ভর্তি পরীক্ষা : রেসিডেন্সি-ননরেসিডেন্সি উভয় প্রায় এক রকম। রেসিডেন্সি ২০০ নাম্বারের পরীক্ষা নন রেসিডেন্সি ১০০। সব কিছু থেকে প্রশ্ন আসে-ক্লিনিক্যাল ,বেসিক ইনক্লুডিং ফরেনসিক, কম্যুনিটি মেডিসিন, তবে কম আসে। ডেভিডসন থেকে এফসিপিএস এর মত সবকিছু পড়া লাগেনা!

সংবাদ

"I Love My Heart- Asia"

ডাঃ তাসদিক হাসান দ্বীপ,১ম ব্যাচ,শহীদ সোহরাওয়ার্দি এমসি,রিসার্চ ফেলো,আইসিডিডিআরবি

First Simultaneous Multi continental Congress on Cardiac disease prevention and awareness (Asia zone)

'I Love My Heart'-the 1st simultaneous multi-continental congress on cardiac disease prevention was held on 24th October 2013 at Shaheed Suhrawardy Medical College, Dhaka with more than 100 participants from 11 medical colleges of Bangladesh .This initiative was taken by Cardiovascular Prevention Student's Network (REPC) of Latin-American Federation of Medial Student's Scientific Societies (FELSOCEM). Bangladesh was the congress organizer of Asia zone, while Nigeria is of Africa zone and Bolivia is of America zone.The general objective of this congress was to work in education and execution of activities to promote cardiovascular health by educating patients, students and professionals in detection and management of cardiovascular risk factors, creating permanent teams to control cardiovascular diseases. Renowned Speakers from different sectors had enriched the event by their wonderful sessions which was followed by a fun cardio-debate and cardio-Cquiz by DQS (Debate and Quiz society) of Sir Salimullah Medical college, Dhaka. Among the speakers Dr. Lima AsrinSayami from NICVD have focused on pathology of cardiac disease where Dr. Kazi Rezaul Ahsan from ICDDR, B gave a lecture on 'Cardiac Anatomy'. Key note Lecture on 'Prevention in cardiovascular diseases' followed by interactive question answer session by Professor Dr. Sharmeen Yasmeen, CEO, PHFBD (Public Health Foundation of Bangladesh) was one of the prime focus of the event.Dr. Md. M. Islam Bulbul,Consultant, HSS & Global Health Cell, DGHS, Ministry of Health & family welfare took an interactive session on Global Heath and CVD. A video presentation on Prevention of Cardiovascular disease, 'Healthy Heart, Healthy life'
by Dr. Gourab Adhikary, ICDDR,B had a great impact on the audience where a Student Presentation on 'New development in percutaneous coronary intervention by Tajdit,

a 5th year medical student got appreciation from the facilitators. The demonstration of 'Cardio Exercise' by MST Halima Khatun, Physiotherapist, United Hospital Bangladesh LTD was informative as well very much relevant with the congress theme. In his speech the continent manager of ILMH-Asia Dr. M. Tasdik Hasan thanked his team for their effort to make this event a successful one after two pre-congress workshop on Basics of ECG and CHD, multiple heart camps and promotional events throughout the year and recommended health research in undergraduate level to get an ultimate positive outcome in disease prevention. Professor Dr. Sharmeen Yasmeen along with the continent manager and other speakers launched the website of the congress for abstract submission for Phase 2 event of I Love My Heart which will consist of scientific paper and poster presentation in next year. It is expected that this courageous venture will open a lot doors of opportunities internationally for the medical students of Bangladesh who are interested in research and disease prevention.

CARDIAC SURGERY in CMCS

Another Glorious event in the history of Chittagong Medical College Hospital

The CARDIAC SURGERY TEAM of Chittagong Medical College Hospital has completed 50 Successful Cardiac Surgery Operation (41 cases Open Heart & 09 cases Close Heart). Cardiac Surgical Team of Chittagong Medical College Hospital-
Dr. Suman Nazmul Hosain, Assoc. Prof. & Head (Cardiac Surgery)
Dr. Fazle Maruf, Asst. Prof. (Cardiac Surgery)
Dr. Muhammad Abdul Quaium Chowdhury, RS (Cardiac Surgery)
Dr. Mohiuddin Ahmed, Asso. Prof. & Head (Cardiac Anaesthesia)
Dr. Mamunur Rahman, Asst. Prof. (Cardiac Anaesthesia)
Dr. Satyajit Dhar, Asst. Prof. (Cardiac Anaesthesia)
Dr. Minhazur Rahman Chowdhury, Jr. Consultant (Cardiac Anaesthesia)
Dr. Subir Barua, Jr. Consultant (Cardiac Anaesthesia)
Naznin Akter, Scrub Nurse.

Today the 50th Cardiac Surgery has been performed on the last day of the year 2013.
This is the only Cardiac Surgery Department in any Govt. Medical College Hospital ever in Bangladesh.

(Collected)

ডাঃ রফিকুল মাওলার "গ্লোবাল এডুকেশন এওয়ার্ড" অর্জন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ রফিকুল মাওলা চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষণার জন্য "ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ডার্মাটোলজি গ্লোবাল এডুকেশন এ্যাওয়ার্ড" লাভ করেছেন। দুরারোগ্য এসএলই (SLE) রোগের উপর তিনি এ গবেষণা পরিচালনা করেন। গত ০৪/১২/১৩ ইং বুধবার ভারতের নয়াদিল্লীতে হোটেল অশোক এ অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ডার্মাটোলজির প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফ্রান্সিস কোকার্ডেল (যুক্তরাষ্ট্র) এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এ্যাওয়ার্ড সাথে পাঁচশত ইউএস ডলার সমপরিমাণ প্রাইজমানি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ডাঃ মোহাম্মদ রফিকুল

মাওলা প্রথম বাংলাদেশী চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ এ্যাওয়ার্ড অর্জন করলেন। এই বিশ্ব সম্মেলনে সমগ্র পৃথিবী থেকে পাঁচ হাজারের অধিক খ্যাতিমান চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত সম্মেলনে ০৫/১২/১৩ ইং সকালে "দামী এবং কষ্টদায়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র চামড়ায় সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখে দুরারোগ্য এসএলই (SLE) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা"এর উপর গবেষণাপত্র এবং ০৭/১২/১৩ সকালে "চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার যৌন রোগের ধরণ ও প্রকোপের" উপর ডাঃ মোহাম্মদ রফিকুল মাওলা গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ থেকে আরো অনেক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। একই সম্মেলনে একাধিক প্রবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া বিরল ঘটনা।

তা ছাড়া দূরারোগ্য এসএলই (SLE) রোগের উপর গবেষণা এবং রোগীদের সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব কিউটিনাস লুপাস ইরাইথেমেটোসাস (EUSCLE) ইতোমধ্যে তাঁকে সম্মান সূচক সদস্য পদ প্রদান করেছেন। তিনি বর্তমানে জগৎ বিখ্যাত লুপাস বিশেষজ্ঞ জার্মানীর প্রফেসর ডাঃ এনেগরেট কুন এবং ইটালীর প্রফেসর ডাঃ অরোরা পেরোডি এর সাথে সহযোগীতামূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। (সংগৃহীত)

যে কথা বলবে না কোন মিডিয়া

রজত দাশ গুপ্ত কে-৬৬

২০১২ সালের ১৭ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত ২৩ তম ইএসসি (European Students' Conference) সম্মেলনে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সাজিদ রেজওয়ান, অনিন্দ্য শামস, মাহমুদ সাকিব এবং শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সায়েম আরাফাত হোসেন, তানভির রহমান অংশ নেন। এখানে সাজিদ রেজওয়ান পাবলিক হেলথ সেশনে প্রথম পুরস্কার পান।
২০১২ সালের ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ভারতের পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতাতে Konference'১২ এ ঢাকা মেডিকেল কলেজ, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। এটিই এখন পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সব থেকে বেশি অংশগ্রহণ। এখানে বাংলাদেশ থেকে ছিল ৯ টি ওরাল (৭ কেস স্টাডি, ১ টি স্বীকার্য, ১ টি গবেষণা) এবং ১ টি পোস্টার প্রেজেন্টেশন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মুরাদ কেস প্রেজেন্টেশনে প্রথম হন। এম তাসদিক হাসান দ্বীপ নির্বাচিত হন সেরা অ্যামবাসেডর। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের সুমাইয়া মাহবুব এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমন শাকিল নির্বাচিত হন সেরা ওয়ার্কশপ প্রতিযোগী।

গত ১২ থেকে ১৪ এপ্রিল ভারতের পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতাতে হয়ে গেল মেডিকেল এবং ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন Kolkata Annual Research and Medical International Congress বা কার্মিকের দ্বিতীয় সম্মেলন। গতবারের মত এবারও অংশ নেয় বাংলাদেশের ১৩ সদস্যের একটি টিম। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে অংশ নেই আমি রজত দাশগুপ্ত, ডা শেখ মাহমুদ হাসান সাগর এবং ডাঃ অভিজিত লৌহ; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে অংশ নেয় অনুরাজ বিশ্বাস অভীক, ফয়সাল আহমেদ এবং আসিফ ইমরান; শহীদ সোরওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে অনিন্দিতা ঘোষ, নাইমা আফরোজ মৌরি, সায়েম আরাফাত হোসেন, সৈয়দ নুরুল আজিজ এবং বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ থেকে নুসরাত জাহান মোনা এবং ফাইজান বিন আজাদ জাস্টিন; সরকারী ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ থেকে ফাহাদ হোসেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই সম্মেলনে সারা বিশ্বের প্রায় ৬০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জন রবিন ওয়ারেন। ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ায় তিনি তার সহকর্মী ব্যারি মার্শালের সাথে প্রমাণ করেন, পাকস্থলীর আলসারের জন্য হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি ব্যাকটেরিয়াম দায়ী। এই জন্য ২০০৫ সালে তাঁরা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি সম্মেলনে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে কথা বলেন।
এই সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা তাদের গবেষণাপত্র সারা বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ পান। এখানে ওরাল প্রেজেন্টেশন এবং পোস্টার প্রেজেন্টেশন নামে দুটি সেগমেন্ট ছিল। সেখানেও ছিল প্রতিযোগিতা। শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই শেষে পোস্টার প্রেজেন্টেশনে তিনটি পুরস্কারই পায় বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা। ডাঃ শেখ মাহমুদ হাসান সাগর এতে প্রথম হন। ডাঃ অভিজিত লৌহ এবং অনুরাজ বিশ্বাস অভিক যৌথভাবে দ্বিতীয় হন। বিচারকরা বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান বিচারক ডাঃ দ্বৈপায়ন মজুমদার বলেন, "রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নানাবিধ সমস্যার ভিতরও বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা এগিয়ে যাচ্ছে এটাই সুখকর বিষয়।"

পুরস্কার জয়ী ডাঃ শেখ মাহমুদ হাসান সাগর বলেন, " এটা একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসেই প্রাইজ জিতব তাও আবার প্রথম পুরস্কার তা ভাবতেও পারি নাই। মেডিকেল গবেষণায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ঘটছে তা এই সম্মেলন থেকেই বোঝা যায়। সরকারের উচিৎ মেডিকেল গবেষণায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া। তাহলে আমাদের দেশেও একদিন জন্মাবে রবিন ওয়ারেনের মত গবেষক।"

এই সম্মেলনে আমাদের সব থেকে বড় প্রাপ্তি ছিল বিদেশীদের সাথে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করা। কিভাবে পড়ালে, কি কি পদক্ষেপ নিলে মেডিকেল শিক্ষা আরও সুন্দর এবং সহজবোধ্য হয়ে উঠবে? এছাড়া ভারতীয়রা তাদের দেশে চালানো হিমোফিলিয়া এবং পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা বাংলাদেশসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে চালাতেও আমাদের উৎসাহিত করে।

৯ থেকে ১১ আগস্ট হয়ে গেল ভারতের নয়াদিল্লীতে "MEDSICON 2013–3rd annual medical students' international conference" যার আয়োজক ছিল বর্ধমান মহাবীর মেডিকেল কলেজ এবং সফদার জং হাসপাতাল। মিলনমেলায় ভারতের সকল প্রদেশ ছাড়াও বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মালয়শিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপালসহ আরও অনেক দেশের ৮০টির ও বেশী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এ বছর বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মোরশেদ আহমেদ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ) এবং তন্ময় শেখর বিশ্বাস (ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ) অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে মোট ১১ টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এর ভিতর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ৫ টি, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে ৩ টি, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে ১ টি এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ থেকে ২ টি।

মেডিকেল ক্যালেণ্ডার

প্রতিষ্ঠার তারিখঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইউনিট-২ ৩০ অক্টোবর-২০১৩।
বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিট ২০ অক্টোবর ২০১৩,। মুগদা জেনারেল হাসপাতাল ১৯ জুলাই ২০১৩,। গাজিপুর মেডিকেল কলেজ ১ জানুয়ারী ২০১৪। সন্ধানী ভবন, ১৯শে ডিসেম্বর,২০১৩

Professor Dr. H.A. M. Nazmul Ahsan, Head of the department Dr. Md. Enamul Karim Dr. Mohammad Azizul Kahhar Dr. Md. Faizul Islam Chowdhury Dr. Khan Abul Kalam Azad Associate Professor Dr. Ahmedul Kabir Dr. Md. Titu Miah Dr. Syed Mohammad Arif Assistant Professor Dr. Partha Pratim Das

ছবিঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ইউনিটঃ
এক ছবিতে সব কিংবদন্তী

মানপত্র

শ্রদ্ধেয় শহীদ স্যারের বিদায় এবং কিছু না বলা কথা

ডাঃ সৈয়দ জুলকার নাঈম শুভ কে-৬৫

আজ রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের প্রধান ও এই মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র প্রফেসর শহীদ স্যারের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল এবং সেই সাথে শুরু হল স্যার এর অবসর জীবন। অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ ছিল স্যারকে নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প ও স্মৃতিচারণ। প্রত্যেকে আজ মন খুলে নিজেদের মনের কথা বলেছেন। অনেকের কান্নাজড়িত কণ্ঠ কিংবা বেশ কিছুজনের ফুপিয়ে কেঁদে ওঠা অতঃপর বক্তব্য শেষ করতে না পেরে মাইক ছেড়ে দেয়া থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও কেউবা স্যার এর বিচিত্র গল্প বলে সবাইকে হাসিয়েছেন। স্যার হয়তো আমাদেরকে অনেক বকাবকি করেন,উল্টা পাল্টা নিয়ম জোর করে চাপিয়ে দেন বা স্যার এর মতো করে পরীক্ষা না দিলে পরীক্ষায় ফেইল করিয়ে দেন কিন্তু স্যার আমাদের সাথে যেভাবে মিশেছেন,গল্প করেছেন, খোঁজ খবর নিয়েছেন তা আর কারো পক্ষে কখনোই সম্ভব না। অন্যদের মত আমিও বলতে চাই যে হয়তো স্যার ক্লিনিসিয়ান হিসেবে ভাল নন,শিক্ষক হিসেবে ভাল নন কিন্তু মানুষ হিসেবে তুলনাহীন। স্যার এর অধীনে আমরা ফিফথ ইয়ারে স্টুডেন্ট ছিলাম এবং ইন্টার্ন ডক্টর হিসেবে কাজ করছিলাম। স্যারকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আর হয়েছে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। স্যার আমাদের ৫-৬দিন ধরে হিস্ট্রি লিখাতেন আর মোবাইলে গান শুনাতেন। ভোর সাড়ে পাঁচটায় স্যার এর ওয়ার্ড ফাইনাল দিতে হসপিটাল যাওয়া এবং সারাদিন পরীক্ষা দেওয়া এবং পরীক্ষার মধ্যেই সবাই মিলে কাচ্চি খাওয়া এগুলো কখনোই ভুলবনা। স্যারকে যেমন দেখেছি রোগীর লোকদের লাথি মেরে ধমকিয়ে সরিয়ে দিতে আবার সেই একই মানুষকে দেখেছি রোগীদের আর্থিক সাহায্য দিতে। স্যার কখনোই আমাদের তেমন পড়াতেন না এই কথা যেমন সত্য তেমন এটাও সত্য যে স্যার আমাদেরকে যেভাবে অনুপ্রাণিত করতেন তা কোন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব না। একটু দেরি করে গেলেই মিটি মিটি হাসি মুখ করে বলতেন, কিরে প্রেমিকা ছাড়েনি ? তুই প্রেম করিস? কতদিন? এগারোটায় কাজী অফিস যাবি, সাড়ে এগোরাটায় বিয়ে আর বারোটায় কাচ্চি! কাচ্চি খা দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে! তখন আর দেরি হবে না!

শেষ বেলাই স্যার এর গালিকে মোটেও পাত্তা দিতাম না। স্যার যদি বলতেন জানোয়ার,মাল,ছাগুন এই কথাগুলো হেসেই উড়িয়ে দিতাম। আবার কখনো সামান্য সন্তুষ্টিতে বলতেন আগুন আগুন পুরাই আগুন! স্যারের প্রচণ্ড চিল্লাচিল্লিতে ঢাকা মেডিকেল কেঁপে উঠত। ভাবতাম এই বুঝি হার্ট অ্যাটাক হল। পরক্ষণে মুখে হাসি নিয়ে বলতেন, কি বুঝলি? তফাৎটা কি বলত? আকাশ আর পাতাল।

স্যার এর প্র্যাকটিস না থাকা সত্ত্বেও স্যার বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে বাহিরে খাওয়াতে নিয়ে গেছেন। জোর করে খাওয়াতেন। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা দারুন উপভোগ করতাম কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদেরই খারাপ লাগত। কৌশলে চেষ্টা করতাম যাতে স্যার আমাদের না খাওয়ান। স্যার আমাদের অসংখ্য বিচিত্র নিয়মাবলী শিখিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকেই সেগুলোতে বিরক্ত এবং হতাশ অথচ কি আশ্চর্য আমরা স্যারের সেগুলোতে এক বিন্দুও ভুল ধরতে পারিনি। হয়তো একটু নিখুঁত বা বিচিত্র কিন্তু ক্ষতি কি! সবার থেকে একটু আলাদা হবার সুযোগ তো থাকে সেসবে। স্যার তার পুরো জীবনে দুই দুইবার মৃত্যুর মুখ থেকে ঘুরে এসেছেন । এবং আবারো ঘুরে দাঁড়িয়েছেন প্রচণ্ড মানসিক ক্ষমতার জোরে।

পরিশেষে বলবো, স্যার আপনি ভাল থাকবেন সুস্থ থাকবেন। আমরা জানি যে আপনি আগামীকাল থেকে এক মুহূর্তও ভাল কাটাতে পারবেন না। অবসর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তও আপনাকে যন্ত্রণা দিবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা ভেবে পাচ্ছিনা হাসপাতাল পাগল এক মানুষ কিভাবে বাড়িতে থাকবেন? এটা আপনার জন্য খুবই পীড়াদায়ক। তারপরও বলবো, ভাল থাকবেন। এই আশা রইল।

শ্রদ্ধেয় এনায়েত করিম স্যারের বিদায়

সৌরভ রায় মৈত্র এবং সরকার মোঃ নাসরুল্লাহ,৩য় ব্যাচ,যশোর এমসি

এফসিপিএস কমপ্লিট করা ৪০০১ জন বাংলাদেশি ডাক্তারের তালিকায় তিনি ৩৮৫ তম। সাইকিয়াট্রিতে এফসিপিএস কমপ্লিট করা ২২ জন বাংলাদেশি ডাক্তারের তালিকায় তিনি অষ্টম। দক্ষ প্রশাসক, সচেতন অভিভাবক, আন্তরিক শিক্ষক এবং সর্বোপরি একজন সত্য, নির্লোভ,সাদাসিধে মানুষ তিনি। আজ যশোর মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডাঃ মোঃ এনায়েত করিম স্যারের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হল। অসাধারণ এ মানুষটির কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার মাত্র তিন বার। এই তিন বারের কথা স্যারের মত ব্যস্ত ও বড় মাপের মানুষের স্মরণে না থাকলেও আমার স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে থাকবে। আজ অনুষ্ঠান শেষে বিদায়ের মুহূর্তে স্যার আমার বহুদিনের একটি ইচ্ছা পূরণ করে গেলেন। আমার অনেক ইচ্ছা ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পা ছুঁয়ে সালাম করার। স্যারকে সালাম করে আজ আমি আমার সেই সাধ পূর্ণ করি, সেই সাথে এই মহান ব্যক্তিত্বের মানুষটিকে একবার স্পর্শ করার সুযোগ হয় আমার।

আজ সংবর্ধনাতে স্যারের এই সারল্যের কথাই বারবার উঠে আসে। মাত্র তিন বছর বয়সের এই কলেজটির অগ্রগতির দিকে তাকালেই উনার কর্মনিষ্ঠার নীরব প্রমাণ মেলে।

এই সৎ, কর্মঠ, শান্ত, ধৈর্যশীল এবং সর্বোপরি সহজ-সরল,মেধাবী মানুষটির প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাই। যশোর মেডিকেল কলেজ এবং পাবনা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ডক্টর এনায়েত করিম স্যারের সুন্দর ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

জার্নাল নিউজ

১.ডাঃ আব্দুল্লাহ বিন সায়িদ,১১তম ব্যাচ,পাওনিয়ার ডেন্টল কলেজ ডিরেক্টর, COHDF

আমাদের প্রথম রিসার্চ পেপার যা ইন্ডিয়ার কেরালাতে অবস্থিত School of Behavioural Science, MG Universityতে অনুষ্ঠিত International Conference of Research Methodology and Scientific Writing (ICRMSW-২০১৩)২০-২২ ডিসেম্বর এ প্রেজেন্টেশন এর জন্য সিলেক্টেড হয়েছিলো। বাংলাদেশ থেকে মাত্র তিনটি পেপার সিলেক্ট হয়েছিলো তার অন্যতম আমাদের পেপার। আমার জানা মতে,আমাদের অর্গানাইজেশনই (COHDF.org) প্রথম (ভলান্টারি অর্গানাইজেশন হিসাবে, ব্যক্তিগত নয় বা চাকুরির সুবাদেও নয়) যা বাংলাদেশের ডেন্টাল সার্জনদের রিসার্চপেপার রাইটিং ও ডাটা কালেকশনে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের মেধাবী ভলান্টিয়াররা নিজেদের রিসার্চ পেপার দেশে-বিদেশে প্রেজেন্ট করবে এবং অংশগ্রহণ করবে। (Children's Oral Health Development Foundation)

২. তন্ময় বিশ্বাস,২০তম ব্যাচ, ফরিদপুর এমসি

এই মাসে আমার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে। গবেষনাপত্রটি নিপাহ ভাইরাসের উপর এবং এতে নিপাহ ভাইরাসের প্রকৃতি, প্রাদুর্ভাব, রোগতত্ত্ব, লক্ষণ-উপসর্গ, টিকা-চিকিৎসা নিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় ও নতুন তথ্যাদি আছে। চিকিৎসকদের জন্য তথ্যগুলো বর্তমানে ও ভবিষ্যতে হয়তো অনেক কাজে লাগতে পারে। লেখাটির লিংক,
http://www.journalyoungmed.com/.../nipah-virus-research.html

মেডিকেল ফ্যাক্ট

১. ডাঃ শোয়েব মোহাম্মদ রিয়াদ,৪৯তম ব্যাচ,শিক্ষানবিশ চিকিৎসক রাজশাহী এমসি

ছাত্রজীবন সুখের জীবন,
যদি না থাকে Examination ।
আর
ইন্টার্নি জীবন সুখের জীবন,
যদি না থাকে Night admission ।

২. সিফাত খন্দকার, কে-৬৮, ঢাকা এমসি

ডাক্তার, শীত কাকে বলে?
যারা হসপিটালে নাইট ডিউটি দেয় তাদের জিজ্ঞাসা করুন ।

৩.ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান মারুফ,৪১তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি,ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন।

মহিলারা বয়স কমিয়ে বলে এটা পুরান কথা।
কিন্তু কদিন আগে চেম্বারে এক বুড়া চাচা আসলে জানতে চাইলাম:
-চাচা, বয়স কত?
-তা বাবা ৩০-৩৫ হবে। পাশ থেকে তার ছেলে ফাল দিয়া বলে:
-কি কও আব্বা, আমার বয়স ই তো ৪০।
-ও তোর ৪০ হই গেছে!! তাইলে আমারো ৪০।
আমি বাপ-বেটার দিক আনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। নাহ! জমজ বলে মনে হলো না।

৪.ডাঃ ইসমেত আলো, ৩২তম বিসিএস, সিরাজদীখান উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র মুন্সিগঞ্জ ১২তম ব্যাচ, জেড এইচ শিকদার ওমেন্স এমসি

'ব্যাথার ওষুধ দেন,পায়ে ব্যাথা পাইসি'
কয় টাকা দামেরটা দিব? ২ টাকা দামের আছে,৩, ,৫, ১০টাকা দামের আছে ।
'শ্বাস কষ্ট হচ্ছে, কোন সিরাপ খেলে ভাল হয়?? কোনটার দাম কত?'
৩০ টাকা দামের আছে, আবার বেশী দামের ও আছে? কোনটা নিবেন?

না উপরের কথোপকথন চাঁদনীচকের কোন দোকানের নয়, নয় কোন বাজারের দৃশ্যপট। এটি ফার্মাসিগুলোর সাধারণ চিত্র। ফার্মাসিতে রোগী আর ফার্মাসিওয়ালাদের যে দরদাম হয় তাতে যেকোন মার্কেট ফেল।

আত্ম ~~অর্ব~~সম্মান

একজন-কাল্পনিক-সাগীর-আলী-ও-অনুপ্রেরণার-গল্প

ডাঃ মৃণাল সাহা,৩৮তম ব্যাচ,সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি,এমডি রেসিডেন্ট(মেডিসিন) চট্টগ্রাম এমসি

যারা দিনের পর দিন গ্রামে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন,নানা কারণে গ্রামের মায়া ছাড়তে পারেননি বা অর্থনীতির যাঁতাকলে, গায়ে লাগাতে পারেননি শহুরে হাওয়া, যারা নিজের অজান্তেই কাঁধে তুলে নিয়েছেন এদেশের গ্রাম বাংলার সহজ সরল গরীবদের চিকিৎসার ভার, যাদের অনেকেই, নিজের উপজেলার মেডিকেল অফিসার পদটার কথা মুখে নিতে পারেন না, তাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে থাকা বন্ধুদের কাছে,ঢাল-তলোয়ারবিহীন এই নিধিরাম সর্দাররাই একেকজন নিজের এলাকায় হয়ে যান দেবতুল্য প্রচণ্ড হতাশায় ডুবতে থাকা এই দেবশিশুরা জানেনও না,কি অসীম তাদের শক্তি! লেখাটা তাদেরই জন্য, আমার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি!

(১) মোটরসাইকেলে দ্রুত স্টার্ট দিয়েই ছুটে চলেন ডাক্তার সাগীর আলী। মনে মনে ভাবেন হয়ত এটাই এ গ্রামে তার শেষ হোমকল। গ্রামের মেঠো পথ আজ সাগীর আলীর কাছে অনেক বেশী আপন মনে হচ্ছে। একটা স্কুলের ছুটি হওয়া ছোট ছেলেমেয়ের দল, তাদের মা-বাবা, দোকানদার বা কৃষক যে সামনে পড়ছে তাকে সালাম দিচ্ছে, গাড়ির গতি আজ একটু কম ! রহীম মিয়ার চা এর দোকানে থামলেন সাগীর আলী। ছোট-বড় অনেকেই তাকে ঘিরে ধরল। এখানকার সব তার চেনা, নামও জানেন অনেকের। এখানকার স্থানীয় না হয়েও গত চার বছরে সাগীর আলী নিজের অজান্তেই এখানকার স্থায়ীদের একজন হয়ে উঠেছেন। দোকানে কথা প্রসঙ্গে একজন স্কুল শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন-ডাক্তার সাব নাকি আমাগোরে ছাইড়া জাইবেন গা ? এইডা কিন্তু ঠিক না স্যার।
- না ইয়ে মানে , একটা কোর্সে যাব এই আর কি।
অনেক দিনতো মা বাবাকে ছেড়ে থাকলাম, এবার একটু ঘুরে আসি। - এক বৃদ্ধ চাচার অভিমানী উক্তি তাইলে আমরা মইরা যাই ? আপনের কি ?
- না চাচা , আমি আছি , থাকব, দোয়া কইরেন !
- একজন বললেন , স্যার চা এর বিল কিন্তু আমি দিতাসি ,
আমার মাইয়ার ডেলিভারির দিন আপনি যেইভাবে সাহায্য করলেন, আমি কোন দিন ভুলুম না !

সাগীর আলী একটু যেন আনমনা হয়ে যান, বুকের মাঝে একটা চিনচিন ব্যথা অনুভূত হয়, চোখে জ্বালা ধরে, সবাইকে সালাম জানিয়ে সাগীর নিজ গন্তব্যে যাত্রা শুরু করলেন! পেছনে পড়ে থাকে একরাশ ভালবাসা আর কিছু আশীর্বাদ বা কারো কারো দীর্ঘশ্বাস! গ্রামবাংলার মেঠো পথের বাঁকে বাঁকে কত যে ভালবাসা ছড়িয়ে আছে, তা এতদিন তার জানা ছিলনা !

মাটির সোঁদা গন্ধে শীতের আমেজ, হালকা কুয়াশার ছোঁয়া। পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্ত গোধূলি, উদাস ধান ক্ষেতের মাঝে ফাঁকা মাঠ, কোথাও বাচ্চারা খেলা নিয়ে ব্যস্ত, হাল্কা একটা শোরগোল। পশ্চিম আকাশের লাল সূর্য, তার বিদায় বেলা জানান দিচ্ছে, সবটুকু লাল নিংড়ে! সাগীর আলীও চাইছেন, এভাবেই যেন তার বিদায় হয়! অনেকগুলো চেনা মুখের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে,অনেকগুলো হাতের উষ্ণতা নিয়ে একদিন তিনি চলে যাবেন এই গ্রাম ছেড়ে। পেছনে পড়ে থাকবে স্মৃতি! হয়তো কেউ চোখ মুছবেন ,কেউ কথাই বলবেন না! কেউবা জড়িয়ে ধরে বলবে, বেস্ট অব লাক!

(২) মনের কোণে অনেক কথা ভাসতে থাকে। প্রায় জনশুন্য রাস্তায় চলতে চলতে তার মনে পড়ে যায় বিগত দিনের অভিজ্ঞতার কথা, অনেক বিনিদ্র রাতের কথা। এইতো সেদিন, রাত দুইটা, হঠাৎ ফোন! জরুরী রোগী। ঘুম ঘুম চোখে এগিয়ে যাওয়া। গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ আর পা ফোলা (প্রি-একলাম্পসিয়া) সাথে লেবার পেইন, বাচ্চা অনেক নিচে, এই রাতে কি করা যায় ?
হাতের কাছে কিছুই নেই, গরীব রোগী। রোগীর লোকজনকে বলতে যাচ্ছিলেন জেলা সদর হাসপাতালে চলে যেতে। রোগীর বাবা তার মনোভাব বুঝতে পেরেই কান্না ভেজা কণ্ঠে অনুনয় করলেন টেকা পইসা নাই স্যার! বাঁচা মরা আল্লাহর হাতে, আপনি উসিলা। আপনি চেষ্টা করেন স্যার, যা পারেন করেন, মইরা গেলে দাবী নাই। আল্লাহ হায়াত দিলে আমার মাইয়া এইহানেই বাঁচবো। বুকটা হুহু করে উঠে সাগীর আলীর, কর্মজীবনে এই ধরনের রোগীদেরই বেশী ভয় করেন তিনি। ভালো কিছু করতে পারলে অনেক শান্তি আর না পারলে কষ্ট, অন্তর্দহন! কিছু করতে না পারলেও ডাক্তার এর আন্তরিক চেষ্টাকে এরা সম্মান করেন, কোন অভিযোগ নেই এদের ! চরম কষ্টেও কাঁদতে কাঁদতে বলে, আপনি অনেক করসেন, আমাদের রোগীর হায়াত নাই, দোয়া কইরেন, আসি। তখন মনে হয়, এরা যেন নিজের আত্মার খুব কাছের কেউ। অবশেষে, সারা রাত কষ্টের পর সেই এক্লাম্পসিয়ার রোগীর সুস্থ হাওয়া সাগীর আলীকে এখনও পুলকিত করে। রাত ভোরে সূর্যের প্রথম আলোয় নবজাতকের কান্না বা অনেক রক্তপাত আর উৎকণ্ঠার পর মায়ের হাসি, পৃথিবীতে অনেক সুন্দর জিনিস গুলোর একটি। এরপর সুস্থ হওয়া রোগীর কেউ যদি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে, সেই সুখ সত্যিই স্বর্গীয়। সেই সাথে তাদের উচ্চস্বরে গুণগান আর আশীর্বাদ যেন পুষ্পবৃষ্টি! এই সুখ শুধু এই হতদরিদ্র, সহজ সরল মানুষগুলো দিতে পারেন,

যারা ব্যবসা নির্ভর শহুরে সুপারক্লাস ক্লিনিক গুলোতে সেবা পান না। ক্লিনিক ব্যবসায় অলাভজনক এই মানুষগুলোর দেয়া অর্ধেক ভিজিটও সাগীর আলীর কাছে অনেক প্রশান্তির । কত রোগী যে মাথা নিচু করে , দুঃখ প্রকাশ করে , অল্প টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে যায়, রেখে যায় অনেক দৃঢ় ভালোবাসার ঋণ। অবস্থাসম্পন্ন মানুষগুলোই বরং ৫০-১০০ টাকার জন্য দেন-দরবার করে , নেতা পরিচয় দিয়ে ফ্রি দেখায় বা সুপারফাস্ট ভিআইপি সার্ভিস চায় !

আজ নিজেকে একটু অপরাধী মনে হচ্ছে সাগীর আলীর। রাত দুপুরে কখনো রোগীর আগমনে বিরক্ত হয়েছিলেন ঠিক ! অবুঝ রোগীকে একটু কটু কথা শুনিয়েছিলেন কখনো কখনো ! আসলে কেউ ফেরেশতা হতে পারেবেন না , সাগীর আলী ভাবেন তিনিও তো মানুষ ! তবু আজ তার অনুশোচনা হতে থাকে । তিনি চেষ্টা করেছেন রোগীকে আত্মার কাছাকাছি নিয়ে আসতে , সমব্যথী হতে । এই গ্রামের অনেক মৃতপ্রায় রোগী তার হাতে সুস্থ হয়েছিলেন । তিনি নিজেও জানেন না , কিভাবে ? তিনি শুধু হৃদয় এর গভীর এর ভালোবাসা দিয়ে তার সেরাটাই করার চেষ্টা করেছেন । নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় তার ! কিছু দান, কিছু সেবা, কিছু শ্রম আর ভালোবাসা যখন একত্রিত হয় , স্রষ্টার আশীর্বাদ তখন যেন দ্রুত বর্ষিত হয়, যা অনেক অচল সমীকরণকেও পাল্টে দিতে পারে !

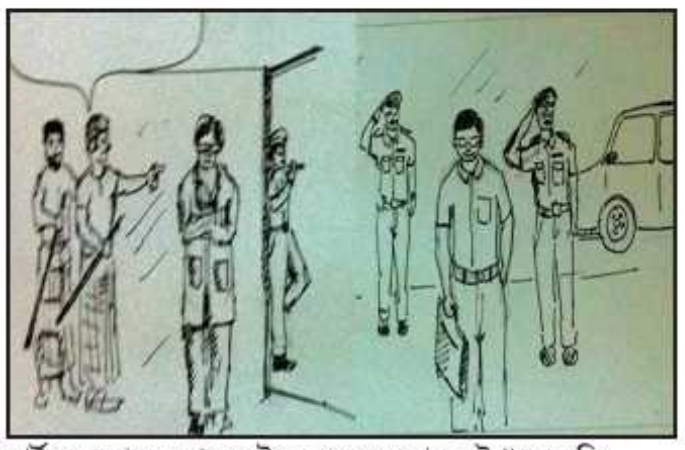

কার্টুন ঃ এনামুল হোসেন ইমন, ৪৮তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি

ঔষধ কোম্পানী

ডাঃ সাইফুল ইসলাম,৩২তম,ব্যাচ রংপুর এমসি,ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল,মালদ্বীপ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন পদে আছি। চাকরির মাস পাঁচেক হয়েছে। একটা চেম্বারে টুকটাক রোগী দেখি সন্ধ্যার পর। প্রথম প্রথম চেম্বারে বসে মাছি মারতাম। হাসপাতালের সব ডাক্তারের মাঝে বয়সে আমি সবচেয়ে ছোট, দেখতে নাকি পোলাপানের মত লাগে। রোগী আমার চেহারা দেখেই ভরসা হারিয়ে ফেলে। ওদের আর কি দোষ দিব? আয়নায় নিজেকে দেখলে নিজেরই ভরসা হয়না।
তো কিভাবে কিভাবে বেশ একটা পরিচিতি হয়ে গেল এলাকায়। রোগীও পেতে লাগলাম বেশ। সেই সাথে চেম্বারে ভিড় বাড়তে লাগল বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভদের (এম.আর) । এখানে বলে রাখা ভাল প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি তাচ্ছিল্য দেখাত এই ঔষধ কোম্পানির লোকগুলো। ভাবখানা অনেকটা এমন ছিল যে এই চেংড়া পোলার চেয়ে মেডিক্যাল সায়েন্স আমরাই ভাল জানি।
চেম্বারে এখন প্রায় প্রতিদিনই এম.আরদের ভিড় লাগে। তারা তাদের ঔষধের গুণকীর্তন করে চলে যেতেন যার যার মতো। ওনাদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে-কোন ডাক্তারের চেম্বার থেকে রোগী বের হলে সেই প্রেসক্রিপশনের ঔষধগুলো দেখে নেন। তার কোম্পানির কয়টা ঔষধ লিখল ডাক্তার তা দেখার জন্যে। আমার ইন্টার্নশিপ থেকেই একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মোটামুটি হাতে গোনা কয়েকটি কোম্পানির ঔষধ ছাড়া অন্য কোম্পানির ঔষধ সচরাচর লেখা হতো না। অবশ্য কিছু কিছু মধ্যসারির কোম্পানির একটি কিংবা দুটি ঔষধের কার্যকারিতার গুণে সেগুলো খুব বহুল ব্যবহৃত ছিল; সেগুলো লেখা হত। যে কটা কোম্পানির ঔষধই ঘুরেফিরে লিখতাম সেগুলোর মধ্যে ছিল স্কয়ার, হেলথ কেয়ার, রেনাটা, এসকেএফ, রোশ, নোভারটিজ, ইনসেপ্টা। দেশে যতদিন ছিলাম শেষ পর্যন্ত এই অভ্যাসটি ছিল।

এর ফলে দেখা গেল অন্য কিছু উপরের সারির ঔষধ কোম্পানির লোক কিছুটা নাখোশ হতে লাগল। আমি বলছিনা এগুলো ছাড়া আর কোন কোম্পানি ভাল কোন ঔষধ বানায় না কিন্তু তাদের কয়েকজনের ঔষধ না লেখার পিছনে আমার একটা স্পেসিফিক কারণ ছিল। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের অমর্যাদা আমি একদম পছন্দ করিনা। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম আমার লেখা ঔষধগুলো আশেপাশের ফার্মেসিগুলো প্রায়শই বদলে দিয়ে বিশেষ কোন একটি বা দুটি কোম্পানির ঔষধ দিতে লাগল। আমি সেই কোম্পানির লোকদের কিছু বললাম না। তবে খবর নিয়ে জানতে পারলাম ঐ কোম্পানির লোকগুলো ফার্মেসির মালিকদের নানা ভাবে খুশি রাখত যেমন বাকিতে ঔষধ দিয়ে রাখা (বিক্রি হবার পর বিল পরিশোধ), বোনাস ঔষধ দেয়া, নানা রকম উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি। আমি নতুন তরিকা হাতে নিলাম-রোগীদেরকে প্রেসক্রিপশন দেয়ার পর বলে দিতে লাগলাম যে ঔষধ লিখেছি হুবহু নাম মিলিয়ে কেনাটা ভাল হবে; অন্য নামের ঔষধ কিনলে যদি রোগ সারতে দেরি হয় সেজন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না। তরিকা কাজে দিল।

ধান্দাবাজ কিছু এম.আর এর নিয়মিত গোমড়া মুখ দেখতে লাগলাম এরপর থেকে। একদিন চেম্বার সেরে ডর্মেটরিতে বিশ্রাম নিচ্ছি। একজন এম.আর আসলেন সাক্ষাৎ করতে। কুশল বিনিময়ের পর আসল কথা পারলেন তিনি হাত কচলাতে কচলাতে।
: স্যার?
- জি বলেন।
: আসলে বলছিলাম কি যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার জন্যে একটা ছোট্ট উপহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। - তাই নাকি? বাহ্ ভাল তো! কিন্তু আমার তো জন্মদিন টন্মদিন কিছু না সামনে, আর বিয়ে এখনো করিনি সুতরাং বিয়ে বার্ষিকীর কোন সম্ভাবনা নেই।
: ইয়ে না আসলে সেইরকম কিছু না। মানে বলছিলাম কি মাসের শুরুতে আপনাকে সামান্য কিছু সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা করেছি অফিস থেকে। এই ধরেন হাজার পাঁচেক; কিংবা আপনি বললে আরও বেশি ব্যবস্থা করা যাবে। - বাহ্ ! চমৎকার ব্যবস্থা তো! তা আরও দুই একটি কোম্পানির কাছ থেকে এভাবে নিলে তো আমার বেতনের ডাবল কামাই হয়ে যাবে কি বলেন? আমার কণ্ঠে মিশে থাকা সূক্ষ্ম পরিহাসটুকু ভদ্রলোকের শ্রবণেন্দ্রিয় এড়ায় নি। তাই চোখ ছোট করে তাকিয়ে আছে।
: আসলে স্যার আরও দুই একজন স্যার বেশ কয়েক মাস ধরেই নিচ্ছেন তো ।
- মবিন সাহেব (বানানো নাম)
: জি স্যার?
- আপনার বয়স কত?
: স্যার বত্রিশ বছর।
- আমি আপনার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট এটা জানেন?
: না স্যার জানা ছিলোনা।
- তবু আপনি আমাকে স্যার ডাকেন, তাই না?
: জি স্যার।
- মনে আছে গত সপ্তাহে আপনি হাসপাতালের সামনের দোকানে বসে চা-সিগারেট খাচ্ছিলেন, অনেক দূর থেকে আমাকে আসতে দেখে আপনি হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিলেন?
: জি, মানে, হ্যাঁ স্যার মনে আছে।
- আজকে যদি আমি আপনার কাছ থেকে এই টাকাটা নিতে রাজি হই তবে বিনিময়ে আমি আপনাকে কি দিয়ে দিব জানেন?
: না স্যার, কিছু দেয়ার প্রশ্ন আসছে না তো ।
: প্রশ্ন আসতে হবে না। এমনিতেই দেয়া হয়ে যাবে। বিনিময়ে আমি আপনার কাছে বিকিয়ে দিব আমার পুরো আত্মসম্মান, আমার এমবিবিএস ডিগ্রীটা, আমার আঠারো বছরের অর্জিত সব জ্ঞান। বলুন এই সবকিছু কি টাকা দিয়ে মূল্যায়ন হয়?

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। আমি অনেক কষ্টে রাগ চেপে বলে গেলাম।
- আজকে আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি হব। দুদিন পর কি হবে জানেন? আমাকে দেখলে আপনি হাতের সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াবেন না। পাশ দিয়ে হেটে যাবার সময় বলবেন, সাইফুল ভাই আসেন এক কাপ চা খেয়ে যান।
: স্যার কিছু মনে করবেন না। আমি আজকে আসি।
- জি আসুন। আর শুনুন-আপনারা চাকরি করে পেট চালান, আমিও তাই। ভাল করেই জানি আপনাকে আপনার চাকরি বাঁচাতে অনেক কিছুই করতে হয়। তবু অনুরোধ সবাইকে এক পাল্লায় মাপাটা ঠিক হবে না। আপনার কোম্পানির যেগুলো ভাল ঔষধ আছে আমাকে চিনিয়ে দিয়ে যাবেন লিটারেচার দিয়ে, ভাল-মন্দ দিক সব ব্যাখ্যা করে যাবেন। ঔষধ ভাল হলে নিশ্চয়ই লিখব। আমাকে কেনার প্রয়োজন নেইরে ভাই।
এরপর ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে চলে গিয়েছিলেন লজ্জাবনত মুখে।

সেদিনের সেই নিজেকে বিকিয়ে না দেয়ার পুরস্কার আমি পেয়েছিলাম বেশ দারুণ ভাবে। ততদিনে সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র পাচ্ছিলাম না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল আমি যেখানে কাজ করতাম সেখানকার ট্রেজারি অফিসের কোন একটা কাগজ নাকি ওরা পাঠায় নি। এখন সেই কাগজ সরকারী নিয়মে আসতে গেলে বহু দিনের ব্যাপার। ঠিক করলাম সদ্য বিয়ে করা নতুন বউকে নিয়ে জায়গাটা একবার ঘুরে আসা যাক। কাজের কাজও হবে, দেশের একদম প্রান্তে অবস্থিত সুন্দর জায়গাটাও আরেকবার দেখে আসা যাবে।

উপজেলা ট্রেজারি অফিস থেকে কাজ সেরে আমি আর আমার স্ত্রী হাসপাতালের দিকে হাঁটতে লাগলাম। হাসপাতালের গেটের কাছে অনেকগুলো মোটরসাইকেল। ওগুলোর উপর বসে আড্ডা দিচ্ছে বেশ কিছু ঔষধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। প্রায় আশি নব্বই গজ দূর থাকতে আমাকে চিনে ফেলল দুই একজন। তারা বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল। তাদের দেখাদেখি যারা নতুন জয়েন করেছে ঐ এরিয়াতে তারাও একই কাজ করল। যখন হাসপাতালের গেটের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছি তাদের মাঝ থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল- স্লামালাইকুম স্যার! কেমন আছেন? বলুন তো এই লোকটি কে? হুম ঠিকই ধরেছেন। এখন আমি আর সেই হাসপাতালের কেউ নই। আমাকে দিয়ে তাদের এক পয়সাও কোন লাভ হবার উপায় নেই আর। তবু যে শ্রদ্ধা আর আতিথেয়তা সেদিন আমাদেরকে তারা দেখিয়েছিলেন সেটা সারাজীবন মনে রাখার মত। টাকার অঙ্কে সে হিসাব হবার নয়। টাকায় সব কিছু হয় না।

কার্টুন ঃ এনামুল হোসেন ইমন

পার্সেন্টেজের খাম

ডাঃ শাহরিয়ার রাফি, ৩৭তম ব্যাচ, শেরে বাংলা এমসি(বরিশাল), লেকচারার, আদ-দ্বীন ওমেন্স এমসি

আমার স্ত্রী এলাকায় একটা ফার্মেসীতে কিছুদিন যাবত চেম্বার করছে। খুবই সামান্য। সন্ধ্যাটা বাসায় বসে থাকলে টিভি দেখা হয় তারচেয়ে চেম্বারে গেলে কিছুটা পড়া হয়, এছাড়া এলাকার নারী পেশেন্টদের প্রয়োজনটা পূরণ করা যায় এই ভেবে চেম্বার তাই বলে ভাববেন না চিকিৎসা সে ফ্রী দিচ্ছে। সম্মানী যে যতটুকু পারে তাই নিচ্ছে। আমার এই লেখাটা এখানে শেয়ার করার উদ্দেশ্য হল আজকে আমার স্ত্রী এমন একটা কাজ করেছে যাতে আমি সত্যি অনেক গর্বিত। ব্যাপারটা হল আজকে তার চেম্বারে পার্শ্ববর্তী একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ম্যানেজার এসেছে; খাম নিয়ে। বুঝতেই পারছেন ভেতরে কি ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী এটা ফিরিয়ে দিয়েছে। ম্যানেজার কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমা চায়। তো সে মুহূর্তে আমার স্ত্রী একটা ভাল জিনিস আদায় করে নেয় উনার কাছ থেকে। ওর দেখা পেশেন্টরা ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে ২৫% কমে ইনভেস্টিগেশন করাতে পারবে। এই ঘটনার পর আমার স্ত্রী যারপরনাই খুশি। আমিও খুশি। আসলে এত প্রলোভন আমাদের চারপাশে যে বিবেক বিক্রি করতে খুব বেশি সময় লাগে না। বিক্রি হয়ে অনেক অর্থ হয়ত উপার্জিত হবে কিন্তু সৎ থাকার যে স্বর্গীয় অনুভূতি তা পাওয়া যাবে না। স্রষ্টা আমাদের চিকিৎসক বানিয়েছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষমতা উনি আমাদের দিন।

ছোট ডাক্তার

ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,৩৯তম ব্যাচ,ময়মনসিংহ এমসি,সহকারী রেজিস্ট্রার(ফিজিক্যাল মেডিসিন),স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

অনেক আগেই একবার বলেছিলাম- এসএসসি-তে এইচএসসি-তে এ প্লাস পাই নাই তো কি হয়েছে শরীরেই তো এ প্লাস নিয়ে ঘুরি। তবে এ প্লাস তো আর আমার একার সম্পত্তি না যে আমার একা থাকবে। আমার কাজিনের বউ-ও শরীরে এ প্লাস নিয়ে ঘুরে। এখন অবশ্য ঘুরতে পারতেছে না। সিজার হবে তাই হাসপাতালে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে। তো এ প্লাসওয়ালীর রক্ত লাগবে; তাই বান্দার তলব। রক্ত দেয়ার জন্য সাইকেল চালিয়ে অবরোধ উপেক্ষা করে ঘাম ঝরিয়ে মনোয়ারা হাসপাতালে হাজির হলাম। এসে শুনলাম ভাবীকে ওটিতে ঢুকানো হয়েছে। আধা ঘন্টা পার হয়ে গেল। কোন খবর নাই। ভিতরে কি হচ্ছিল বুঝতেছি না। এতক্ষণ লাগার কথা না। বাচ্চাকে কি স্কুলে ভর্তি করে বের করবে নাকি কে জানে? মাগরিবের সময় নামাজ পড়তে গেলাম। বের হয়ে শুনি বাচ্চা নিয়ে আসা হইছে। শ্বাস কষ্ট তাই ইনকিউবেটরে রাখতে হবে। কাজিনের আফসোস আমি একটু দেখলে ভালো হতো আসলেই ইনকিউবেটরে রাখতে হবে কিনা। যেখানে বাচ্চাটাকে রাখা হয়েছে ওখানে গেলাম বাচ্চাটার ব্যাপারে আলাপ করতে। সিস্টার হায় হায় করে উঠলো। মনে হলো দরজার ভিতরে পাড়া দেই নাই; এটম বোমার সুইচে পাড়া দিছি। নিজের পরিচয় দিলাম। তাও সিস্টার সন্তুষ্ট না। বুঝলাম না সিস্টারের সাথে না ফার্স্ট লেডীর সাথে কথা বলছি; যারে বলে সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি। মেজাজ পুরা বিলা হয়ে গেলো। আরেক সিস্টার দয়া করে জানালো এক শিশু ডাক্তার নিচে বাচ্চাকে দেখেছে। উনিই বাচ্চাকে ইনকিউবেটরে পাঠিয়েছে। আজিব ব্যাপার- ডাক্তার এই ব্যাপারে রোগীর লোককে ব্রিফিং দিবে না? ওটি থেকে বের করেই ইনকিউবেটরে পাঠিয়ে দিয়েই দায়িত্ব শেষ? শুনলাম ওটি থেকে বের হয়ে একজন নাকি বলেছিল বাচ্চার শ্বাস কষ্ট; ইনকিউবেটরে রাখতে হবে। উনিই সেই শিশু বিশেষজ্ঞ। নিজের পরিচয় দেয়ারও উনার সময় হয় নাই। আমার কাজিনেরা উনাকে চিনতে পারে নাই; এইটা তো কাজিনের দোষ; তাই না? কিছুক্ষণ পর একজন আমাকে ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল। একজন ডাক্তার বসে আছে; বুঝলাম ডিউটি ডাক্তার। নিজের পরিচয় দিলাম। উনার চেহারার একটা মাংশপেশীরও কোন পরিবর্তন হলো না। আমরা তো ভদ্রতা করেও একটা হাসি নাই। বুঝলাম উনার মাঝে এইসবের বালাই নাই। বাচ্চার ব্যাপারে জানতে চাইলাম। উনি বললেন মায়ের ডায়াবেটিস ছিল। এই বলে উনি আমাকে Gestational Diabetes-এর উপর একটা মিনি লেকচার দিলেন। স্টুডেন্ট লাইফে অনেক কিছু ঝাপসা ছিল;

উনার লেকচার শুনে ক্লিয়ার হয়ে গেলো। যাই হোক উনি উনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাকে সময় দিয়ে ধন্য করলেন। নিচে তখনো আমার কাজিন দাঁড়ানো। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরও আর খবর পাওয়া গেলো না। অপারেশন করা ডাক্তার উনারও দেখা মিললো না। কাজিন বার বার বলতেছিল- উনাকে আমরা এতদিন ধরে দেখাই- অথচ উনি অপারেশন করে যাবার আগে আমার সাথে একটু কথা বলার প্রয়োজন মনে করলেন না।
কিছুক্ষণ পর মিষ্টি মুখ করে মনোয়ারার নাটক শেষ করে বাসায় ফিরলাম।

দুইটা কথা-শ্রদ্ধেয় স্যারেরা; রোগীর লোকের সাথে একটু কথা বইলেন। ওরা কেউ নেলসন পড়ে আসে নাই; কেউ ডেভিডসন পড়ে আসে না। ওরা আপনার কাছে জানতে চায়। আর আপনাকে তো আর ফ্রি বলতে হচ্ছে না। আপনি আপনার চার্জ নিচ্ছেনই।
ডিয়ার ম্যাডাম; ওটি করে সাথে সাথে চলে যাওয়া কি উচিৎ। রোগীর লোকের সাথে দুইটা কথা বলে গেলে কি এমন ক্ষতি হতো? কিন্তু রোগীর লোকেরা যে একটু মানসিক শান্তি পেতো তা একটু ভাবলেন না।
নিজেও পেশায় ডাক্তার। মাঝে মাঝে ভয় হয়- যদি এদের মত ডাক্তার হয়ে যাই। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি- হে আল্লাহ! যদি এমনি ডাক্তার হতে হয় তাহলে আমার বড় ডাক্তার হবার দরকার নাই। সারা জীবন আমি ছোট ডাক্তারই থাকতে চাই।

প্রস্তাবনা

প্রসঙ্গ যখন অনাহারী

ডাঃ ফারজানা রহমান,৪২তম ব্যাচ, সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি

Honorary training ওরফে আমাদের,ডাক্তারদের ভাষায় অনাহারী সম্পর্কে কম বেশি আমরা সবাই জানি। এই অমানবিক প্রথা দূর হোক এটা চায় না এমন কেউ নাই। কিন্তু এই প্রথা দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত কেউ নেয়ার চেষ্টাও করেনি। ডাক্তার প্রজাতির মত মেরুদণ্ডহীন প্রজাতি সম্ভবত আর নাই। যাই হোক আসল কথায় আসি-৭,০০০ টাকা দিয়ে FCPS part 1 পরীক্ষা আমরা ধার করে হলেও দিব কিন্তু সাত পয়সা honorarium ও আমরা পাব না। বলা যেতে পারে পেতে চাই ও না। সরকারের উপর ভরসা করে বসে থাকলে এটা কখনও সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয়না। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা কিভাবে লোপাট হয় এটা এখন ওপেন সিক্রেট। তাই অনাহারী বিষয়ে আমাদের নিজেদের এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করি। কিছু প্রস্তাবনা;* Honorarium এর পরিমাণ হতে হবে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা। * এই টাকার জন্য আমরা পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভর করব না। * নতুন system চালু করার ব্যাপারে সরকারের অবদান থাকবে কিন্তু পুরো ব্যাপারটার পরিচালনায় থাকবো আমরাই। * স্বাস্থ্য সেবা আমরা সরকারি হাসপাতালে দিয়ে থাকি সেই আদিকালের ১০ টাকার টিকেট সিস্টেমে। এটাকে আমরা সামান্য modify করতে পারি যেমন outdoor patient দেখার ব্যাপারে ১০ টাকার টিকেট সিস্টেম বাতিল করা। জনগণের মধ্যে কার্ড সিস্টেম চালু করা। জনগণের সামর্থ্য অনুযায়ী কার্ড দেবে সরকার। উদাহরণ স্বরূপ যার মাসিক আয় ৫০০০ টাকা তাকে দেয়া হবে হলুদ কার্ড যার মানে হল সে যখন outdoor এ দেখাবে তাকে ৫০ টাকার টিকেট কাটতে হবে। এভাবে মাস শেষে যা টাকা উঠবে তা দিয়ে honorarium দেয়া হবে। যতটুকু ঘাটতি থাকবে তার যোগান আসবে সরকারি অনুদান থেকে। এতে করে পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হল না।
(প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে প্রস্তাবটি যেভাবে এসেছে এখানে অপরিবর্তিত অবস্থায় দেয়া হলো,পরবর্তি সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে পাঠকের মতামত, প্রস্তাবের সংশোধন,সংযোজন-বিয়োজন প্রকাশ করা হবে, মতামত দিতে পোস্ট করুন প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে)

কর্মঘন্টা

ডাঃ নির্ঝর অলয়,৪৬তম ব্যাচ,রাজশাহী এমসি

ডাক্তারদেরকে নামমাত্র বেতনে দিনরাত খাটিয়ে নেবার জন্য আমাদের বেসরকারী খাত ও কিছু ধুরন্ধর কনসালট্যান্ট বেশ কিছু চতুর মিথ্যার আশ্রয় নেন। যেমন কিছুদিন আগে আমার এক সিনিয়র আপু বললেন, ডাক্তাররা নাকি শ্রম আইনের আওতায় পড়ে না। তখন তাকে সুন্দর করে বোঝাতে হল যে, ডাক্তারি একটি স্কিল্ড অকুপেশন এবং এই সংক্রান্ত সব সাধারণ আন্তর্জাতিক নিয়ম ডাক্তারের ক্ষেত্রে আর সব স্কিল্ড পেশার মতোই প্রযোজ্য।
যেসব মিথ্যাচার করা হয়ঃ
১ পৃথিবীর সব দেশে দিনে ৮ ঘণ্টা করে ৬ দিনে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হয়।
২ রেসিডেন্সি মানেই ২৪ ঘণ্টা ওয়ার্ডে পড়ে থাকতে হবে।
প্রথমটি একটি ডাহা মিথ্যে কথা যার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা। পৃথিবীর কোন দেশেই এমনকি বাংলাদেশেও কোন স্কিলড পেশাতে ওভারটাইম ছাড়া ৪০ ঘণ্টার বেশি সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা প্রযোজ্য নয়। ২০১০ সালের শ্রম আইনে যে, ৬x৮=৪৮ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহের কথা বলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকদের জন্য। স্কিলড পেশাগুলোতে ৬ দিনের যুগে ৫x৭=৩৫+বৃহস্পতিবার হাফ ডে ৩.৫ ঘণ্টা, মোট ৩৮.৫ঘণ্টা এবং বর্তমানে ৫x৮=৪০ ঘণ্টা/সপ্তাহ প্রচলিত। ডাক্তারদের সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা বরাবরই আউটডোরে ৬x৬.৫(৮টা-আড়াইটা)=৩৯ ঘণ্টা। ট্রেনিং পোস্টে সাধারণত এর চেয়ে বেশি করতে হয়। কিন্তু ট্রেনিং এর বিষয়টি আসলে ভিন্ন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বেসরকারী খাতে যেভাবে ৬ কে ৮ দিয়ে গুণ করা হয়েছে এবং মিথ্যাচারের মাধ্যমে ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে- সেটি সিভিল পেশায় সম্পূর্ণ হাস্যকর। এর একমাত্র উদ্দেশ্য কম ডাক্তার নিয়োগ করে চালানো এবং বেশি মুনাফা অর্জন। কর্মদিবসকে ৩ শিফটে ভাগ করলে প্রত্যেককে সপ্তাহে ৬ শিফট করে করালে মাত্র ৪ জন ডাক্তার দিয়ে সপ্তাহের ২১টি শিফট চালিয়ে তিনটি উদ্বৃত্ত শিফট থাকে। এখানে ৬ এর জায়গায় ৫ শিফট এবং ৪০ ঘণ্টা/সপ্তাহ চালু করলে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে ১ জন নতুন চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে। ১২ ঘণ্টার শিফটে ভাগ করলে সপ্তাহের ১৪টি শিফট ৪ জন ডাক্তার দিয়ে পূর্ণ করে ২শিফট উদ্বৃত্ত থাকে। কর্মঘণ্টা ৩x১২=৩৬ ঘণ্টা বা ৪০ ঘণ্টা করলে এসব হাসপাতালেও প্রতি বিভাগে অন্তত ১ জন করে বেশি নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা, মুনাফা এবং মুনাফা। কাজেই ভাবার কোন সুযোগ নেই যে, ডাক্তারি পেশাটাই এমন, পোড়া কপাল! সত্যি বলতে ডাক্তাররা যাতে প্রতিবাদ না করে, সেজন্যেই তাদের মধ্যে এই ভুল ধারণাগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার কনসালট্যান্টরা উচ্চ বেতন পান বলে কর্পোরেট হাসপাতালে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টায় চাকরি করতে রাজি হয়ে যাচ্ছেন। বলি হয়ে যাচ্ছে তরুণ চিকিৎসকরা। বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি দেশের সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা এমনঃ
১ ওমান ৫x৭=৩৫ ঘণ্টা ২ মালদ্বীপ৫x৭=৩৫ ঘণ্টা ৩ ব্রাজিল ৫x৭=৩৫ ঘণ্টা ৪ ফ্রান্স ৫x৭=৩৫ ঘণ্টা (ফ্রান্স স্বাস্থ্যখাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে বিশ্বসেরা) ৫ ইংল্যান্ড ৫x৮=৪০ ঘণ্টা (তথ্যসূত্রঃ রয়েল লন্ডন হসপিটালের সিনিয়র হাউজ অফিসার) ৬ যুক্তরাষ্ট্র ৫x৮= ৪০ ঘণ্টা (রেসিডেন্সি সমাপ্ত হবার পর, রেসিডেন্সিতে বর্তমানে সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টা প্রচলিত)
এর পর থেকে প্রতি ঘণ্টার জন্য বিভিন্ন হারে বাড়তি সম্মানী দেয়া হয়।

ইউরোপে আইন করে ডাক্তারদের সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে অন্য সব পেশার মতোই। (ইউরোপিয়ান ওয়ার্ক ডিরেক্টিভ) অর্থাৎ ৩৫ বা ৪০ ঘণ্টার পর ওভারটাইম দিয়েও ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। আমাদের দেশে সর্বনিম্ন ৪৮ ঘণ্টা না করলে বেতন কাটছে। ইংল্যান্ড এবং রয়েল কলেজের সনাতনপন্থীরা এই নিয়মের বিরোধিতা করে আসছে রোগীর চিকিৎসায় হ্যান্ডওভারজনিত বাধা এবং ট্রেনিং ব্যাহত হবার কারণ দেখিয়ে। কারণ ট্রেনিং পোস্টেও এই আইন প্রযোজ্য। এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছে অধিকাংশ তরুণ চিকিৎসক এবং তারা সরাসরি রয়েল কলেজের সিনিয়রদের সঙ্গে তর্ক করার "দুঃসাহস" দেখাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত কোন স্টাডিতেই সীমিত কর্মঘণ্টা ট্রেনিংকে ব্যাহত করছে-এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। রেজাল্ট আগের মতই আছে এবং স্টাডিগুলো বলছে পেশেন্ট কেয়ারও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না। উল্লেখ্য রয়েল কলেজের ডেটা অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে এই আইনের পূর্বে ফাউন্ডেশন ইয়ার-১ (ইন্টার্নশিপ) ব্যতীত অন্যান্য ট্রেনিং পোস্টে সপ্তাহে গড়ে সর্বোচ্চ ৫৬ ঘণ্টা এবং অন্যান্য সপ্তাহে গড়ে ৪৬ ঘণ্টা কাজ করতে হত। কাজেই ফাউন্ডেশন ইয়ার ১ বাদে অন্যদের এই আইনের ফলে কর্মঘণ্টায় খুব একটা রদবদল হয় নি। এই আইনের ফলে জীবনযাপনের মান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

বেসরকারী খাত প্রয়োজনের তুলনায় অল্প ডাক্তার নিয়োগ করে নামমাত্র বেতনে। ফলে সার্ভিস একটু খারাপ হয়, জনরোষ এবং খুন-জখমের শিকার হয় তরুণ ডাক্তাররা। কর্মঘণ্টার দায় না থাকাতে সরকারী হাসপাতালে কেউ মুখে রক্ত তুলে সপ্তাহে ৭০-১০০ ঘণ্টা খাটছে, কেউ মাসে ২-৪ দিন অফিস করছে। তাই অবিলম্বে ডাক্তারদের একটি যুগোপযোগী, কার্যকর এবং সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর্মনীতি গড়ে তুলতে হবে, যেখানে পদাধিকার বা অন্য কোন প্রভাব খাটিয়ে কেউ ফাঁকি দিতে পারবেন না, কেউ শোষিত হবেন না।

fRaNkLy SpEaKiNg -০১ জিপি সিস্টেম

ডাঃ জুবায়ের মাহমুদ খান,৪৫তম ব্যাচ রাজশাহী এমসি,৩২তম বিসিএস
ডিবি গ্রাম ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র,চাটমোহর পাবনা

ইংল্যন্ড, আমেরিকার সাদা চামড়ার সাহেবরা ভদ্রলোক। এই ভদ্রলৌকিকতার কারণে হলেও তারা ডাক্তারী পেশায় 'দালাল' রূপটিকে অন্যভাবে ডাইভার্ট করে দিয়েছে। তাদের দেশে GP (খুব সম্ভবত elaboration General Physician or General Practitioner) এর ব্যবস্থা আছে। প্রথমে রোগীরা এদের হাত দিয়ে ভালো হলে ভালো, নয়তো Referred হয়ে আরো উপরে হাজির। তারপরও ভালো না হলে আরো উপরে একেবারে সৃষ্টিকর্তার দরবারে উপস্থিত। Frankly Speaking, এই GPরা যদি স্পেসিফিক স্পেশালিটির কাছে রোগী হস্তান্তর করে ঠিক আছে কিন্তু স্পেসিফিক স্পেশালিস্টের দরবারে রোগী পাঠালেই তারাও এক ধরণের দালাল। আসুন দেখি আমাদের দেশেও এই সিস্টেম চালু করলে কি কি উপকার এবং অপকার হতে পারে।

উপকারসমূহ: ১. যারা সদ্য ইন্টার্নী শেষ করা ফ্রেশ ডাক্তার, তাঁদের নিয়ে চেম্বারে বসানোর জন্য একটা টানাটানি লেগে যাবে। Frankly Speaking, থ্রি ইডিয়টস এর ICE এর শেষ বর্ষের ছাত্রদের যেমন Final পরীক্ষার আগে ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য অনেক কোম্পানী পাগল থাকে, তেমনি এদেশের অলিতে-গলিতে-গজিয়ে ওঠা অসংখ্য মেডিকেল সেন্টার নিজেদের প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে হলেও ডাক্তার খুঁজবে।
২. উপরোক্ত কারণে জুনিয়র ডাক্তার বাবুদের মানসিক হতাশা কমবে। পাশ করে মনে হবে কিছু একটা পাশ করলাম। এবং এই মধুর টানাটানিতে আত্মমর্যাদাটাও জাগতে থাকবে।
৩. GP তে একটু একটু করে পকেট ভরতে শুরু করলে বড় বড় স্যার/ ম্যাডামদের টাকার খোঁয়াড় নিয়ে টানাটানির কোনো অবকাশ থাকবে না।
৪. ডাক্তারের দাম আবার মোঘল সম্রাট বাবরের আমলের মত হয়ে যাবে। (যখন রাজবদ্যিরা হুমায়ূন এর অসুখ সারাতে না পারার পরও বাবর তাদের সাথে এখনকার রোগীর লোকদের মত মারপিট না করে আল্লাহর কাছে নিজের জীবনের বিনিময়ে ছেলের জীবন চেয়েছেন।)
৫. সর্দি জ্বর, শরীর ম্যাজম্যাজ, খাওয়ায় অরুচি, কিছু ভাল্লাগে না, কষা পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিশেষ জ্ঞানের অপচয় হবে না।
৬. Unauthorized গ্রুপের ডাক্তারি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে ৫নং এ উল্লেখিত উপসর্গে Ceftriaxone inj পাওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। Frankly Speaking, Drug resistance এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
৭. মানুষ তখন MBBS ডিগ্রীকে আর Simple MBBS বলবে না।
৮. Specialized Centre গুলিতে অযথা ভিড় করা রোগীদের ভিড় না থাকায় সেখানে আস্তে আস্তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাঝে Research এর মানসিকতা তৈরি হবে।
৯. আগে যে জটিল রোগীটা সাধারণ রোগীদের আড়ালে একই রকম ভাবে ১০মিনিটে দেখা হয়ে যেত, সেই রোগীটাই তখন ৩০মিনিট সময় পাবে।
১০. বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সিরিয়াল নিতে মন্ত্রী, MP, সচিবদের লবিং লাগবে না। Frankly Speaking,উনারাও সিরিয়াল দখল করার সিলি ম্যাটারে ক্ষমতা না খাটায়ে দেশের কাজে মন দিতে পারবেন।

দূরবীনে চোখ

USMLE- A Goldmine for Foreign Medical Graduates: Introduction to USMLE, Why you will pursue USMLE

ডাঃ নোবেল চৌধুরি,৫০ তম ব্যাচ চট্টগ্রাম এমসি, শিক্ষানবিশ চিকিৎসক

Prelude: Before starting preparation for USMLE one must have clear conception about Medical school system of USA.Why we have to take USMLE exams? Why USA wants foreign medical graduates? Why you will pursue USMLE (Prospects of USMLE)? Are we the only smarter people pursuing USMLE?

Is it a Dream or a Mirage - The Hidden Trap

You already know "The American Dream" - the dream of lifetime. Well, it's even greater and shinier if you are foreign medical graduate and thinking (!) for USMLE exams and doing post-graduation (residency) in USA. The information that will be described below is the accumulation of my background research and analysis over a year. Please share the knowledge to your classmates, friends, relatives who are studying in medical college or have become doctors already. Who knows this might change their life!

Medical school system of USA Well, you may have struggled a lot to get selected in the Medical College in Bangladesh. After studying 12 years in school and college, you appear in admission test. You get selected in Government/private medical college and continue your study for barely any fees at Govt. Institutions or a good amount of bucks at Private Medical colleges. But in USA, it"s a whole different story. There, after 12 years of academic life you have to give SAT (Scholastic Assessment Test) first and obtain good score if you want to secure good undergrad subject. If you have dreams of becoming a doctor then you must have to do a Bachelor degree of Four Years in biological science in Biology or Chemistry as major. These are known as Pre Medical Subjects (Pre- Med). The total fee of four years is around $40,000 - 1,20,000/more (!!) . You should end your bachelor with high CGPA. Then you have to prepare for MCAT (Medical College Admission TEST). It's another great battle where you must secure good marks to apply for medical school. With all these done, only then you are ready to apply in medical schools (another 4 year program), where you will be selected after rigorous selection process. It's not the end. Maximum medical schools in USA are private institutions and are highly costly. There is no medical school which costs less than $40,000 per year.

In USA, most of the students take Student Loan for paying the undergrad and graduation studies fees.So, at the end of medical school the sum of student loan stands at least 300,000$- more! And it grows interest over the years and gets higher. It"s only during residency when students start to earn money. And they start paying the debt in installments. It"s been seen in many cases that the US student (Doctor) finishes paying the debt over the decades. The total he/she pays in his lifetime to become a doctor is about $600,000 as the interest grew along with time.

Why we have to take USMLE exams:Actually, USMLE Step 1, Step 2 CK and Step 2 CS exams are the same as Professional Examinations we give in our country.

Step 1= First prof. + Second prof. equivalent
Step 2 CK + Step 2 CS= Final prof. equivalent
Step 3= the final exam for license to practice in USA (we have no such exam for license)

Not only the foreign medical graduates, but also all medical students of medical schools in usa have to give usmle steps. USA students give-

Step 1 -at the end of 2nd year of medical school
Step 2 CK, step 2 CS- at the end of 4 th year of medical school
Step 3- At the end of first year of residency (first year of residency is considered as internship in USA)

So to judge all medical graduates (US and international) USMLE steps are set as the standard tool of measurement.

Why USA want foreign medical graduates:This part is very interesting. Why suddenly the most powerful nation on earth with most advanced medical education and technology is looking for foreign medical graduate like you from the other parts of the world? What a shame isn"t it?

Well, there are lots of reasons behind this. They want you as badly as you want USA residency. The reasons are-

i) You have already noticed how much costly is this to be a Doctor in USA. So, it"s considered as a fancy profession for the rich people in many cases. ii) The time to become a Doctor is formidable. You need 13 years (at least) to become a specialist doctor (say, cardiologist) from the time you finish 12th standard. 13 year= 4 year Pre-Med+ 4 year medical school+ 3 year Internal Medicine residency+ 2 year fellowship in Cardiology). This is the only way how a US student can become Cardiologist.

iii) The most important reason is-
They have more residency positions then their total student numbers. Yes, they confirm that when an US student enters a US medical school he/she will be given a residency position(Postgraduation) according to his/her credentials. At present the number of USA medical students 19,000 (approx) in about 200 medical schools around the country. But the residency position offered is about 25,000 - 26,000! It fluctuates a little bit over time, with increase/decrease in residency positions in particular subject areas. Why you will pursue USMLE (Prospects of USMLE):I think you already figured out how lucky you are being an IMG. If you didn"t , here are reasons why you will dedicate yourself to USMLE-i) You didn't have to waste 4 years studying pre-med. You didn"t have to give grueling SAT,MCAT.
ii)You are completely free from the tension(!!) of $300,000 and the growing interest over it.
iii) The prospects of USMLE are seamless. Even if you think about salary that is a dream.
Salary during residency - $4,000-4,500 per month ($40,000 -55,000 per year)
Salary after residency(if you work in any hospital) - There is no medical specialty with salary less than (!)$100,000 per year. Very demanding specialty may bring you upto $300,000 or ever more!!
iv)Not only the financial benefits but also the opportunity of being medical/research scientist is waiting at your doorsteps.
v)With 3 year of residency(MD) and 2 year of fellowship (optional) you can live the rest of your life happily .
vi)When you have American MD , you are the king of the world. You can have job in any country of the world. If you"re not interested in settling in USA then go to Europe or Australia . The door is open.But if you have FCPS, non American MD, MRCP,FRCP, FRCS, anything in the world the US health system would not let you enter until you pass the USMLE steps and complete your residency (MD) from there.

Are we the only smarter people pursuing USMLE:No sir. You are the laziest and most backdated USMLE aspirants. But if you are reading this note, consider yourself very lucky if you are still studying in MBBS or finished it in last few years. You still have the golden chance. Advanced medical students of India, Pakistan, China, Europe start their journey of USMLE from the very first day of their student life of MBBS. They are hundreds of steps ahead of us. This is the reason they constitutes the 90% of the total IMGs doing/have done residency in USA.So, get informed, be motivated and start your journey for USMLE.

Is it a Dream or a Mirage- The Hidden Trap:All these sound too beautiful. Isn"t it ? But the most beautiful roses have sharp thorns too. So let"s know what"s the catch -
i) It"s a "single chance" game. You have to perform your best in every exam in first time.
ii) You don"t have whole life to pursue USMLE. The earlier you start the more chance you will have. As you become old your chance will become slim. There are hundreds of old IMGs in USA who couldn"t secure residency. So be aware of timeline ! iii) So, you have to be completely dedicated for USMLE. If you have another plan leave it till the end of your journey of USMLE. It"s an "once in a lifetime" opportunity. So give your full time behind it. In conclusion, you have to be sincere, diligent, persevering and clearly desperate to pursue USMLE. It"s a long tiring journey, so you need to be motivated and focused for this whole period.
Let"s begin this journey together and help each other to reach the ultimate goal – " Residency".
Wish you all the best in the USMLE steps.

প্যালিয়াটিভ মেডিসিন-এর শুরুর কথাঃ

ডাঃ তাহসিনা আফরিন,৩৩তম বিসিএস ফরেন সার্ভিস ক্যাডার (রিকমেন্ডেড),এমডি পার্ট টু রেডিয়েশন অনকোলজি ,এনআইসিআরএইচ, ৪৬তম ব্যাচ, চট্টগ্রাম এমসি

আমরা কারা?- চিকিৎসক।
আমাদের কাজ কি?- অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করা।
টেক্সট বইতে যত রকম রোগ আছে, তার বেশির ভাগের চিকিৎসা আমাদের মুখস্ত। কিন্তু ভেবে দেখি, কি চিকিৎসা দেবো, এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে, যারা ভুগছে -
- end stage malignancy- HIV- motor neuron diseases- multiple sclerosis- cardio-vascular accident- chronic organ failure
- অথবা প্রকৃতির নিয়মেই এসে পরেছে জীবনের একদম নিভু নিভু গোধূলিতে?
এদের সুস্থ করতে পারবেন? আছে এমন কোন সঞ্জীবনী যা এসব রোগীদের সুস্থ করতে পারে আর সব রোগের মত? যদি রোগীর রোগী কখনো সুস্থ হবে না , জানা যায়, আমাদের দায়িত্ব কি শেষ হয়ে যায়? সে কেন আসবে আমাদের কাছে যদি আমরা তাকে সুস্থ না-ই করতে পারি?

তার মানে ডাক্তার হিসেবে আমাদের কাজ হল, রোগীর ভালো করা। তাকে সুস্থ করাটা এই ভালো করার একটা বাই প্রোডাক্ট মাত্র। সে জন্যই আমরা গরিব রোগীকে যতটা পারি দামি টেস্ট দেই না, দুরারোগ্য রোগ সারাবার জন্য তাকে ঘটিবাটি বিক্রি করতে নিরুৎসাহিত করি। চিকিৎসার ব্যয় বহুল অপশনগুলো এড়িয়ে সহজ লভ্য অপশন গুলো বেছে নেই। অথচ সুস্থ করাটাই প্রধান লক্ষ্য যদি হতো, আমরা শুধুই টেক্সট বই ফলো করে চিকিৎসা দিতাম। ডাক্তার সেদিন ভগবানের ছায়া হন, যেদিন তিনি রোগীর ভালোটাই ভাবতে শেখেন।

প্রশমন চিকিৎসা অথবা palliative treatment হল সোজা বাংলায় সেই সব রোগীদের 'ভালো করা' যারা আর কখনো 'ভালো হতে' পারবেন না।

ভালো হতে পারবে না!
তাহলে ভেবে দেখুন একজন চিকিৎসক হিসেবে এটা কত বড় ব্যর্থতা ! মানুষের জন্মের আগে থেকেই যেখানে ডাক্তারের সেবা মায়ের পেটের ভেতর থেকে পায়, সেই মানুষটাকে জীবনের এই চরম মুহূর্তে আমরা 'আর কিছুই করতে পারিনা' বলে বাড়ি পাঠিয়ে দেই 'ভালো মন্দ খাবার জন্য'! সব ডাক্তারের জন্যই এটা অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত, আমরা সহজে চাইনা কেউ এমন হোক যার 'সুস্থতা' আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো না। তাকে আমরা এড়াতে চাই। কিন্তু সমাজে, পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে যে সাবজেক্টেই আমার আনাগোনা হোক না কেন, এই রকম রোগী পাওয়া যাবে। আমরা কি তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার 'ভালো করার' জন্য পাশে থাকতে পারি না?
Palliative specialist Robert tycross বলেছেন- "ধীরে ধীরে, আমি আমার ক্ষমতাহীনতার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম! আমি এটা আমার জীবনে অনুভব করলাম, আমার কাজে অনুভব করলাম। এই বোধকে ভয় না পাওয়ার একটা উপায় হল-এর থেকে পালানোর চেষ্টা না করা। এর মুখোমুখি হওয়া। সেই মৃত্যু পথযাত্রী জানেন, আমি ঈশ্বর নই! সে শুধু চায়, আমি যেন তাকে ছেড়ে না যাই!" তার মানে সুস্থ না করেও আমরা পাশে থেকেই রোগীকে 'ভালো রাখতে' পারি। এবং আমাদের রোগী আমাদের কাছে এটাই চায়। এটাই palliative treatment এর অনুপ্রেরণা। একজন palliative doctor হিসেবে আমরা রুগীর ইতিহাস শুনব একদম তার পাশের বাড়ির বন্ধুটির মতো। কিন্তু টেবিলের এপার- ওপারে বসে আমরা ডাক্তাররা যে communication করি সেটা ভেবে দেখুন কিসের মতো! হুম, মনে পরেছে! একদম সেই স্কুলের বুকের রক্ত পানি করে দেয়া হেড মাষ্টারের সামনে কিছু বলতে যাবার মতো! এই অবস্থায় কি empathy ! আর কি communication! রুগী কিছু বলে পালিয়ে বাঁচে! তাই palliative এর ইতিহাস নিতে হয় কোন রকম টেবিল ছাড়া, কোলের মধ্যে ফাইল ছাড়া, হাতের ভেতর কলম ছাড়া ,শুধু মিনিট-ঘন্টাববিহীন ঘড়ির সাথে ! যেন আলাপে বসেছেন আপনি কারো সাথে, কারো কোন তাড়া নেই, কোন অন্য চিন্তা নেই শুধুই তার গল্প শোনা আপনার কাজ!
রোগী বলবে তার সমস্যার কথা। এতদিন ধরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে হাজারো ডাক্তার দেখিয়ে , হাজারো চিকিৎসা নিয়ে তার হাঁপিয়ে উঠার গল্প! ফাইলের পর ফাইল, কাগজের পর কাগজ জমতেই থাকে! আপনি তার কাহিনী শুনলেন, বুঝলেন আপনার palliative center এ আসার কারণ সে জানে না। সে তার রোগ ভালো হবে না, এই খবর জানে না। এদিকে তার সাথে আসা তার স্ত্রী আপনাকে ইশারা করে বলছে, রোগীকে কিছু না জানাতে! Palliative communication এর খুবই কমন এই দুটি phenomenon -breaking the bad news, খারাপ খবরটা দেয়া এবং collision handling, পারস্পরিক লুকোচুরিটা দূর করা। এই দুই ক্ষেত্রেই আছে কিছু নিয়ম নীতি, কিছু সার্বজনীন ধাপ। যেগুলো ফলো করে আমাদের রোগীকে জানাতে হবে আসল সত্যটি।

palliative dealing এর তিনটা শর্তঃ honesty, openness, autonomy. আপনি রোগীর প্রতি honest থাকবেন, তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না। আপনি রোগীর সাথে খোলামেলা আলাপ করবেন তার রোগ নিয়ে। আপনি রোগীর ইচ্ছাকেই সরবার্গ্রে প্রাধান্য দেবেন। তার রোগ শারীরিক হতে পারে, মানসিকও হতে পারে। আপনি এটা জানেন। আপনাকে তার physical, social, psychological, spiritual এসব দিক ঠিক করা লাগবে কারণ আপনি জানেন health এর সংজ্ঞাতেই আছে এই কম্পনেন্টগুলো। Palliative রুগীর লক্ষণ/উপসর্গের অভাব নাই। mild to moderate pain, vomiting, seizure, bowel disturbance , wounds, bed sore থেকে শুরু করে cord compression, superior venacaval obstruction, electrolyte imbalance পর্যন্ত! ইতিহাস নিয়ে আপনি রোগীর শারীরিক সমস্যার সমাধান করবেন একজন ডাক্তার এর মতো, যতটা করা যায়, যতটা তার কষ্ট, ব্যাথা, অস্বস্তি কমানো যায়।

Life of an Intern: A 365 Days Project by Dr. Ayatul Amin, K-65 DMC

সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান দেবেন বন্ধুর মতো। তার ছুটি শেষ, চাকরিতে ফিরে যেতে হবে। অথবা চিকিৎসায় ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। অথবা তিনি ছাড়া আর কেউ নেই সংসার দেখার । তার কেউ নেই তাকে পাহারা দেবার। অনেক অনেক অনেক সামাজিক সমস্যা তার রোগের যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। আপনি মরফিনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ব্যাথা কমে না! আরে , ব্যাথা তো অন্যখানে! আপনি যদি না জানেন তার মনের কষ্ট গুলো কি এবং কেমন, কিভাবে কমাবেন তার total pain!?

শুনতে হবে কিছু difficult questions -আমি কোনদিন খারাপ কাজ করিনি, আমার কেন এটা হল ডাক্তার? আপনারা এতো কিছুর চিকিৎসা পরেছেন, আমার রোগটা কেন পরেন নি? আমি কতদিন বাঁচবো? আমার পরে আমার পরিবারের কি হবে? এসব অন্তহীন প্রশ্ন যত দিন তার মাথায় ঘুরবে ততদিন তার জীবন মান quality of life বাড়ানো সম্ভব হবে না।
তাই তার সব spiritual প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, একজন ধর্ম যাজকের মতো! সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের নিজের spiritual thoughts যদি আপগ্রেড না থাকে, তাহলে রোগীও সেই সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সদস্য হিসেবে আমাদের সবার আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা বাড়াতে হবে। এখন অবশ্যই আধ্যাত্মিকতা মানে আস্তিকতা নয়, এটা জানতে হবে আমাদের। মহা জগতের অনেক অজানা কথাকে সরল এবং গ্রহণযোগ্য করে ধারণ করাই আধ্যাত্মিকতা। মৃত্যু নিয়ে যদি আপনার মধ্যেই ভাবার সীমাবদ্ধতা থাকে, তবে মরণাপন্ন রোগীর সাথে কিভাবে আলাপ করবেন মৃত্যু নিয়ে! কিভাবে তাকে প্রস্তুত করবেন একটা good death এর জন্য?

বুঝতেই পারছেন এই ধরণের চিকিৎসায় 'প্যারাসিটামল দুই বেলা' টাইপ প্রেস্ক্রিপশানের ভূমিকা কম। এই রোগের চিকিৎসা হল আপনার communication! একমাত্র empathy and communication এর সাহায্য নিয়েই আপনাকে 'ভালো করতে' হবে সেই সব কষ্ট যা দুনিয়ার বাঘা বাঘা সব টেক্সট বই পারেনি কমাতে! এটাই palliative treatment এর একমাত্র চ্যালেঞ্জ।

আপনার রোগী কে? আপনাকে ভিসিট দেয়ার খাতায় যার নাম লেখা হবে শুধুই কি সে? রুগীর সাথে তার স্ত্রী আসেন, তার ছেলেমেয়েরাও আসে, তার বন্ধু আসে, প্রতিবেশী আসে। আপনি জানলেন রোগটা ভালো হবার নয়। আপনি এটা জানালেন রুগীর সাথে আসা সেই আত্মীয়দের। তারা মেনে নিল, রুগীর সেবা করছে, তাকে ভুলিয়ে রাখছে কষ্ট গুলো-এবার আপনি চেয়ে দেখেন, কার মুখটা বেশী অসুস্থ? অবাক হয়ে দেখবেন, রুগীর আত্মীয়দের মুখটাই আপনার বেশী অসহায় মনে হবে। আপনি দেখবেন তারা দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে physically, socially, psychologically, spiritually । এবার বলুন, আপনার সামনে কত গুলো 'অসুস্থ' মানুষ ? শুধু কি যার নামে সিটটা ভাড়া নেয়া হল সে, নাকি উদয়াস্ত তার পাশে যে আছে সেও আপনার মাধ্যমে 'রোগী' হিসেবে 'ভালো হবার' অধিকার রাখছে? Palliative medicine এ আপনার রোগী তাই সেই একজন নয়! আপনার কাছ থেকে 'ভালো হয়ে' ফিরবে রোগীসহ তার কাছের প্রতিটা মানুষ।

আপনার দীর্ঘদিনের রোগী অনেক দিন রোগে ভুগে অবশেষে মারা গেলেন। আপনি তার কষ্ট কমিয়েছিলেন সে জন্য তিনি খুশী ছিলেন, পরিবার তার মনের দুশ্চিন্তাগুলো কমিয়েছিল তাই তিনি শেষ দিনে খুশী ছিলেন, আপনি তাকে জীবন মৃত্যুর ধাঁধা পরিস্কার করে বুঝিয়েছিলেন সেজন্য সে মৃত্যু নিয়ে শঙ্কিত ছিলনা অথবা আপনাদের এত প্রচেষ্টা কিছুতেই কিছু হল না , সবাইকে অসহায় 'কিছুই করতে পারছিনা' অবস্থায় রেখে তিনি চোখের সামনেই কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন, মৃত্যু যাই হোক, সেটা জীবিতদের ছুঁয়ে যাবেই।

তাই রোগীর আত্মীয়দের জন্য bereavement সেশান করা হয়। রোগীর ফেলে যাওয়া আত্মীয় স্বজনদের মনের কষ্ট হালকা করার চেষ্টা palliative care giver কেই করতে হয়। কারণ এক জনের জন্য বাকিরাও শোকে তাপে অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। ওয়ার্ডে থাকা বাকি রোগী, যারা মৃত্যুর দিন গুনছেন, তারা যে রোগীর শেষ সময় এত কাছে থেকে দেখেছেন, তাদের psychological trauma টার কথাও ভাবতে হবে।

ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে অনেক মৃত্যু দেখেছি, কিন্তু palliative এ এসে দেখা মৃত্যু আমার কাছে অনেক অন্যরকম ছিল। কারণ এই রোগীরা জানতেন তারা মারা যাবেন, তারা অনেক অন্য রকম আচরণ করেন পুরোটা সময়। তাদের স্মৃতি অনেক বেশী পীড়া দেয় মনে। অথচ বাকি রোগীগুলোকেও আপনার হাসি মুখে দেখতে হবে। এক রোগীর দুঃখ অন্য রোগীকে দেখানো যাবে না। তাই আপনার জন্যও করতে হবে debriefing সেশান। ডাক্তার হয়েও আপনাকে নিজের শোকটা হালকা করতে হবে। দিনের শেষে তাই সব palliative center এ সবাই একসাথে বসে আলাপ করেন রুগীদের নিয়ে, দুঃখ শেয়ার করেন, দুঃখ কমিয়ে আনেন। চিকিৎসা বিদ্যায় palliative care তাই অন্যরকম সহমর্মী একটা জগত। এখানে কেউ একা কাজ করতে পারেন না, team ছাড়া এখানে কাজ করা অসম্ভব। অক্টোবর এর ১২ তারিখ, বিশ্ব palliative দিবস। এবারের প্রতিপাদ্যঃt 'Achieving Universal Coverage of Palliative Care: Dispelling the Myths':(২০১৩) আমাদের প্রাণের পতিষ্ঠান BSMMU- center for palliative care থেকে পালন করা হয় দিবসটি। ক্ষুদ্র পরিসর হলেও বাংলাদেশে palliative সেবা দিয়ে যাচ্ছে এই center for palliative care. একজন চিকিৎসক হিসেবে এখানকার কার্যক্রম দেখে যাবার জন্য আপনি সব সময়ই আমন্ত্রিত। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য নতুন ডাক্তারদের মধ্যে palliative শব্দটির অন্তত পরিচয় করিয়ে দেয়া। palliative এর universal coverage থেকে এখনো অনেক দূরে আমাদের দেশ, তবুও অন্তত সৃষ্টিকর্তা না করুন, আমাদের পরিবারের কেউ এমন দুরারোগ্য রোগ হলেও যেন দায়সারা 'বাড়ি যেয়ে ভালো মন্দ খান' টাইপ কথা শুনে ব্যাথা গুলো মনে চেপে আমাদের না ছেড়ে যান। আমরা যেন তাদের জন্য হলেও শেষ দিনগুলোর palliative care টা নিশ্চিত করি। সব শেষে Robert twycross sir এর আরেকটা অসাধারণ কথা দিয়ে শেষ করছি ...
" You matter because you are you ,you matter to the last moment of your life, and we will do all we can.
not only to help you die peacefully, but to live until you die!"

শ্রদ্ধাঞ্জলী

১. আহমেদুল হক কিরণ,৩য় ব্যাচ,ইস্ট ওয়েস্ট এমসি

"অধ্যাপক ডাঃ মো. আব্দুল হাই স্যার "
MBBS (DAC),M. Sc,Ph D,FCPS
যদিও উনাকে চিনতে অবশ্য এত বিশেষণের দরকার হয়না, "দ্যা নাম্বার ওয়ান ফিজিওলজিস্ট অফ বাংলাদেশ"- ব্যাস, এক কথায় শেষ। উনাকে নিয়ে এতো এতো কিছু লিখার আছে, যার কোন শেষ নেই। আমার সময় স্বল্পতার কারণে অল্পকয়েকটি কথাই আজ বলবো-
মৃত্যুকালে উনি আমাদের কলেজের (ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ) একাডেমিক অ্যাডভাইসর ছিলেন। মেডিকেলের শুরুতে উনাকে চিনতাম না আসলে / বুঝতাম না যে উনি কে? কিন্তু, প্রায় সব বিষয়ের টিউটরিয়াল ক্লাসে স্যার/ম্যাডাম'রা এমনভাবে উনার কথা বলতেন যে- উনি নিজেই বোধহয় আরেকটি পাঠ্যবিষয়। ধীরে ধীরে খুব সামান্য হলেও বুঝতে পেরেছিলাম যে- কে ছিলেন উনি। আমার বুকসেলফে এখনো উনার সব লেকচার নোটগুলো আছে।

স্যার আমাদের তুলনায় বয়সে কতটা প্রবীণ, তার কয়েকটা উদাহরণ দেই। একবার আমাদের কলেজে প্রফেসর জাহিদ এসেছিলেন, উনি বক্তৃতায় বলছিলেন- "হাই স্যার হলেন আমাদের দাদু লেভেলের স্যার আর তোমাদের জন্য উনি হলেন বড়-আব্বা লেভেলের স্যার।" উনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক হকের মাননীয় বন্ধুবর ছিলেন। উনি ডি.এম.সি. থেকে পাশ করলেও এম.বি.বিএস. এর পাশে (DAC) লিখতেই বেশি পছন্দ করতেন, কারণ উনি কোন আমলে ডাক্তার হয়েছেন- সেটা বোঝানোর জন্য। উনি যখন লন্ডনে ছিলেন, তখন সেখানকার ইংরেজ বাবুরা সাদা পোশাক পড়তেন।

স্যার যে আমাদের তুলনায় মনের দিক থেকে কতটা আধুনিক, এবার তার কয়েকটা উদাহরন দেই। ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় অনেক প্রবীণ স্যারের কঠিণ আপত্তি থাকলেও উনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্নমতের। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা ছেলেমেয়েরা ক্লাসে আলাদা আলাদা বসলেও স্যার এই ব্যাপারটা'র ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। উনি বলতেন- "তোরা যদি রিডিং পার্টনার থেকে লাইফ পার্টনার হস, তাহলে তো কোন সমস্যা নাই। একসাথে পাশ কর, বাড়ি থেকে বিয়া না দিলে আমি কলেজে তোদের বিয়ার ব্যবস্থা করমু।" উনি আজকালকার মেয়েদের নিয়ে একটা কথা প্রায়ই বলতেন- "তোরা সারাজীবন প্রেম করবি একটার লগে আর বিয়া করবি আরেকটারে..." (কেউ পার্সোনালি নেবেন না)। স্যার সাংবাদিকদের ভুল তথ্য পরিবেশন করা নিয়ে একটা কথা বলতেন- "আমি দৈনিক আজাদের ওপর মুতিও না"।

স্যার যে কতটা কড়া ছিলেন, এবার তার একটা উদাহরণ দেই। আমাদের কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বলছিলেন তাঁর ছাত্রজীবনের ঘটনা। তিনি যখন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে ছিলেন, হাই স্যার তখন হোস্টেল পরিদর্শনে ছিলেন। স্যারকে দেখে পুরো হোস্টেলের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে ভয়ে সবাই চুপ করে ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন।
স্যার সর্বদা স্পষ্টভাষী ছিলেন, কখনো মুখের ভিতর কথা লুকিয়ে রাখতেন না। দাপটের সাথে চলাফেরা করতেন সবসময়। স্যার বলতেনঃ "আমি কোন হসপিটালে গেলে ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি থেকে নামি না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই হসপিটালের কর্মকর্তা কেউ না এসে আমার গাড়ির দরজা খুলে দেয়। দারোয়ান দরজা খুললেও আমি নামি না।" শিক্ষক হয়েও সারাজীবন সবসময় ছাত্রদের পক্ষেই কথা বলে এসেছেন। উনি একটা টপিক পড়ানোর সময় কিছুক্ষণ পড়ানোর পর সর্বদা একটা কথা বলতেনঃ "এর থেকে বেশি তোদের লেভেলে আর লাগবে না। তোরা ফেল করস কেন, জানোস নাকি? তোদের যখন কেউ বেশি ধরে ফেল করায়, তার মানে হইলো- সে এম.বি.বি.এস'এর লেভেল জানেনা।"

স্যার একবার কোন এক মেডিকেল কলেজে (সম্ভবতঃ ময়মনসিংহ/রংপুর) কার্ড ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা নিতে হলে ঢুকেছেন, কিন্তু পোলাপাইন নাকি পরীক্ষা দিতে রাজি না। তো, স্যার শুরু করলেন- অভিনব স্টাইলে পরীক্ষা নেয়া। বই খুলে যে যা পারো, লিখো। শর্ত- বই শুধু গাইটন ও হল'এরটা খোলা যাবে। কেউ কেউ নাকি স্যারের সামনে শুধু খাতা নিয়ে বসেছিলো, বই দেখে লিখার সাহস হয়নি। আর অনেকে নাকি উত্তর যে বইয়ের কোন পাতায় আছে, খুঁজে পাচ্ছিলো না। "ফুটনোটঃ "গাইড বই স্যার একদম সহ্য করতে পারতেন না।"

আমার ফিজিওলজি ভাইভা পরীক্ষার অভিজ্ঞতাঃ শুরু'তে স্যার ছিলেন না, ওয়াসরুমে গিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী থেকে এক্সটার্নাল এসেছিলেন। এক্সটার্নাল ম্যাডাম আমার পরীক্ষা নিবেন আর কি! উনি স্যারের পাশের চেয়ারে বসতে পেরেছেন বলে একটু পরপর শুকরিয়া আদায় করছিলেন। স্যার এসে বসা মাত্রই উনি তাঁর ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে এক ল্যাব এসিস্টেন্ট মামা'কে ডাক দিলেন। স্যারের দিকে নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে মামাকে ফটো তোলার নির্দেশ দিলেন। ম্যাডাম আমাকে বলছিলেনঃ "মাথা ঐদিকে ঘুরায় রাখো... এবার সামনে থাকাও, ইত্যাদি।" স্যারের ছিলো প্রফ পাশ করানোর বিশাল এক ক্ষমতা। উনি আমার সামনে ওপর বোর্ডের আর্মড ফোসের্স মেডিকেল কলেজের এক এক্সটার্নালকে ডেকে বললেনঃ "ঐ, কয়জনরে ফেল করাইছোস এই পর্যন্ত?" উত্তরঃ "স্যার, ৪জন"। হাই স্যারঃ "নাম্বার পেন্সিল দিয়ে দিসোস না? এইবার যা... মুইছ্যা ঠিক কর। তুই নিজে আমার বই পইড়া পাশ কইরা আবার আমার ছাত্রদের ফেল করাস?"
স্যারের ছিলেন প্রচন্ড পরিমাণে পোশাক সচেতন। অনেকসময় ম্যাচিং না হলেও তিনি এমনসব কম্বিনেসনের ড্রেসআপ করতেন, যা দেখে "থ" হয়ে যেতাম আমরা। প্রচন্ডশীতে আমাদের কলেজের এক পিকনিকে টগবগে রক্তধারী ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা যখন পারলে ২টা করে সোয়েটার পরেছে, তিনি সেদিন পাতলা ফিনফিনে হাওয়াই শার্ট পরে ঘুরে বেরিয়েছেন পুরো স্পট।

আমি এতোক্ষণ যা যা বলেছি, তার প্রতিটা লাইনের পেছনে এক একটা গল্প রয়েছে। কিন্তু পরিশেষে কথা একটাই- আমাদের প্রাণপ্রিয় "হাই স্যার"কে হয়তো অনেকেই চেনেন না। কিন্তু, স্যার আমাদের পুরো দেশের জন্য একটা সম্পদ ছিলেন। আমি স্যারের সরাসরি ছাত্র হিসেবে সারাজীবন গর্ব করে যাবো। আপনারা সকলেই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ উনাকে বেহেশত নসিব করেন।

২. ডাঃ খোশরোজ সামাদ, রাজশাহী এমসি

রফিকউদ্দিন স্যার : তুমি রবে নীরবে নিশিথিনি সম

গত ১৮ ই অক্টোবর ,২০১৩ ,আনুমানিক রাত ৯ টায় আমাদের প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক ডাঃ রফিকউদ্দিন আমাদের সকল মায়া ছেড়ে চলে গেছেন অন্যভুবনে। (ইন্না লিল্লাহে—ওয়াইন্নালিল্লাহি রাজিউন।) ।

প্রায় বছরখানেক মরণ ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন রফিক স্যার। যার হাতে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি পরাজিত হয়েছিল তিনি জীবনের অন্যতম বড় সত্য মৃত্যুর হলাহল পান করলেন অনেকটা নীরবে, নিভৃতে।

রফিকউদ্দিন স্যার রাজশাহী মেডিকেলে কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। এই জ্ঞানতাপস নিছক প্রথাবদ্ধ শিক্ষাদানরীতির বৈপরীত্যে বাতিঘরের মত প্রজ্ঞার আলোকশিখা জ্বালিয়ে ছিলেন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে একাগ্র সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

সরকারী চাকুরীর শেষ সময় কাটান ঢাকা মেডিকেলে মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসেবে। বি সি পি এস-এ নীতি নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশ্বস্ততার সাথে। সরকারী চাকুরী শেষে তিনি এনাম মেডিকেলে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন ।

রফিক স্যারের মৃত্যুতে শুধু হাজারো গুণমুগ্ধ ছাত্র তাঁদের শিক্ষাগুরুকে হারালো না, অসংখ্য জটিল-মুমূর্ষু রোগী তাদের চিকিৎসককেই হারালো না, জাতি হারালো অসাধারণ মেধাবী বহুবিধ গুণের অধিকারী একজন সাত্ত্বিক সাধককে।

রফিকউদ্দিন স্যার ব্যক্তিজীবনে বিনয়ী, সদালাপী, তীক্ষ্ণ রসবোধ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন। বেগম রফিকউদ্দিন আমাদের আরো এক আলোর পথ যাত্রী, অধ্যাপক রোকেয়া। ম্যাডামের অসাধারণ পেশাগত জ্ঞানের পাশাপাশি তাঁর আন্তরিকতা, আতিথিয়তা ঋদ্ধ হয়েছি অসংখ্য ছাত্র -ছাত্রী।

অল্প ক'বছরের ব্যবধানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হারাল নক্ষত্রসম অনেক আলোকবর্তিকাকে। তাঁদের মধ্যে আখতার স্যার ,সিদ্দিকী স্যার,আসাদী স্যারসহ অনেক দেউটি নিভে গেল একে একে।

স্যার ,আপনার অসীমের পানে এই যাত্রায় আমরা আপনার হাজার ছাত্র -ছাত্রীরা যারা আপনার বিশাল ছায়ায় পরিপুষ্ট তারা স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধাভরে। রফিকউদ্দিন স্যার, প্রিয় শিক্ষক আমার, 'তুমি রবে নীরবে নিশীথিনী সম '।

স্যার,ওয়ার্ডের রাউন্ড শেষে আপনার সাথে হেঁটে হেঁটে ফিরবার সময় আসমান ভাঙ্গা জোছনায় ভিজে গিয়েছিলাম বহুবার। আজো আকাশে কোজাগরী চাঁদ, ভরা পূর্ণিমার তীব্র আলোতে ভিজে যাচ্ছে নগর জনপদ।

৩. ফাতিমা ফারিহা আনিকা, ৭ম ব্যাচ,এনাম এমসি

গত ১৮ই অক্টোবর ২০১৩ইং, রাত ৯টা ৪০মিনিটে চলে গেলেন আমাদের এনাম মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসর ডাঃ এ.কে.এম রফিক উদ্দিন স্যার! বিগত ১০বছরে এনাম মেডিকেল কলেজের জন্য সবচাইতে কষ্টের দিন আজ! এনাম মেডিকেলের জন্য উনার অবদান কখনই ভোলা যাবে না,আমরা ভুলবনা। স্যারকে বিগত প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে দেখছি এবং হাতেগোনা কয়েকটা দিন উনার ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়েছে। উনাকে যতটুকু জানতে পেরেছি সেই প্রেক্ষিতে কিছু কথা লিখছি।
স্যার একজন ডাক্তার হিসেবে কি ছিলেন তা নিজে না দেখলে বুঝবেন না! পেশেন্ট ছিল উনার কাছে সব কিছু! আমরা যখন হিস্ট্রি নিতে যেতাম, তখন উনার কখনোই পছন্দ হত না, কেন? কারণ উনি বলতেন পেশেন্ট এর সাথে এমন সম্পর্ক বানাতে হবে, যাতে পেশেন্ট খুশি হয়ে তোমাকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে বসে! উনি যখন পেশেন্ট এর সাথে কথা বলা শুরু করতেন প্রথমে "বাবা অথবা মা" বলে এত সুন্দর করে ডাক দিতেন যে বলে বোঝানো যাবে না এবং যত সময়ই লাগুক না কেন উনি ধৈর্য ধরে পেশেন্টের সবকিছু শুনতেন! একটা মানুষের সেবা কিভাবে করতে হয় ,মানুষের যত্ন কিভাবে নিতে হয় উনাকে না দেখলে শেখা সম্ভব না ।

উনার সহধর্মিনী আমাদের কলেজের টিচার! স্যার আর ম্যাডামের সম্পর্ক এই বয়সে দেখলেও অবাক হয়ে যাওয়া লাগত! ম্যাম বলত প্রতিদিন সকালে উঠে যদি স্যারকে আলমারি থেকে শার্ট বের করে না দেয় তাহলে স্যার বসে থাকত ম্যাডামের অপেক্ষায়!! স্যার পড়াশুনা, ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স এর ব্যাপারে অনেক স্ট্রিক্ট ছিলেন,উনি বলতেন ডাক্তার হওয়া এত সহজ না অনেক কষ্ট করতে হয় কারণ একটা মেশিন এর পার্টস নষ্ট হয়ে গেলে বদলানো সম্ভব কিন্তু কোন মানুষের গায়ে পিন ফুটলেও তা অনেক কিছু!আমি যখন থার্ড ইয়ারে উঠি, তখন আমার আর আমার এক ফ্রেন্ড এর মাথায় আসছিলো যে সার্জারির প্রফেসর ডাঃ খলিলুর রহমান স্যার আর প্রফেসর ডাঃ রফিক স্যার, উনারা না থাকলে কি হবে মানুষের? আমরা তো কোনদিন উনাদের মত হতে পারবনা! উনাদেরকে ছাড়া সবাই অচল হয়ে যাবে! আজকে রফিক স্যার এর চলে যাওয়া শুনে মনে পড়ে গেল সেই কথা! এখন কি হবে সবার?

হ্যাঁ সবাই চলা শিখে যায় ! কিন্তু উনি যেই জায়গায় ছিলেন,যা কিছু করে গেছেন, উনার যে পরিমাণ জ্ঞান ছিলো তাতে পরবর্তিতে আর কারো পক্ষে এমন হওয়া সম্ভব না!

জানি এখনো আমাদের টিচাররা প্রতিটা এগজামিনেশন করবেন আর বলবেন' এটা রফিক স্যার করতেন'.. আমরা আগের চেয়ে অধিক আগ্রহে তা শিখে নেব, রফিক স্যার এর মত তো হতে পারব না তাই অন্তত উনার শেখানো কিছু জিনিস নিজের মাঝে গড়ে তুলব। আর ভবিষ্যতে যখন পেশেন্ট দেখবার সুযোগ হবে,উনি থাকবেন উনার সব স্টুডেন্টের আদর্শ! কিছু কষ্ট রয়ে গেল। আজীবন থাকবে, উনাকে পেলাম না, আর পাব না! উনি যেখানেই আছেন যাতে একটু উনার আশীর্বাদ এর হাত আমাদের মাথায় রাখেন এই প্রার্থনাই করি। 'কীর্তিমানের মৃত্যু নেই'- থাকবেন উনি আমাদের মাঝে প্ল্যাটফর্মের সকলের পক্ষ থেকে উনার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ছবিঃ প্রমা মজুমদার, ৯ম ব্যাচ,এনাম এমসি

৪. রজত দাশগুপ্ত কে-৬৬ ঢাকা এমসি

আইভরি কোস্টে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ তোহিদ-উল-মুলক মারা গেছেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কে ৪২ ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। এই সেনা কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ মেডিকেল কন্টিনজেন্ট-৯ (ব্যানমেড-৯) এ কর্মরত ছিলেন। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে মিল্কপার্ক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৮ ডিসেম্বর আইভরি কোস্টে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পান তোহিদ-উল-মুলক। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জোহানেসবার্গে স্থানান্তর করা হয়।

তিনি ১৯৮৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন এবং এম বি বি এস পাস করেন।
তোহিদ-উল-মুলক ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এএমসি কোরে কমিশন পান। পরবর্তীতে তিনি অবেদন বিদ্যায় এফ সি পিএস ডিগ্রী অর্জন করেন এবং সৌদি আরব থেকে কার্ডিওথোরাসিক এনেস্থেসিয়াতে বিশেষায়িত উচ্চতর প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকা সি এম এইচে যোগদান করেন। গতবছর ২৪ জানুয়ারি তিনি শান্তি মিশনে আইভরি কোস্টে যান। তাঁর সহধর্মিনী লেফটেন্যান্ট কর্নেল শারমিন ঢাকা সেনানিবাসে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের এ্যানাটমি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করি।

৫. ডাঃ নিলয় দেব,১৪তম ব্যাচ,ফরিদপুর এমসি

চলে গেলেন আরো একজন ডাক্তার।
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ এর কমিউনিটি মেডিসিন এর প্রাক্তন প্রভাষক এবং সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ এর প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ গৌতম গত পরশু এক রোড এক্সিডেন্ট এ আহত অবস্থায় স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি হোন। উনি সবাইকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান। সবাই উনার আত্মার শান্তি কামনা করুন।

৬. আব্দুল্লাহ আল নোমান,১৯তম ব্যাচ,জালালাবাদ রাগীব-রাবেয়া এমসি

সফলদের জীবনের পরিসমাপ্তির ঘন্টা যেন একটু বেসুরো ভাবে বেজে উঠে। হয় সময়ের আগে না হলে খারাপ সময়ে। সঠিক সময়ে যেন এদের বিদায় হয় না। জীবনের প্রতিটি পদে এরা যেন রহস্যের ছাপ রেখে যায়। রেখে যায় এমন কিছু দীপ্ত পদক্ষেপ, যখন পেছনে ফিরে দেখা হয় তখন যেন এই পদক্ষেপগুলো জ্বলজ্বল করে আপন মহিমায়। কিন্তু রহস্যময়তা যেন এই জ্বলজ্বলে ভেতরে জানান দেয় নিজের উপস্থিতি। "Angel শুভাগত বৈদ্য" এসোসিয়েট প্রফেসর,জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, সিলেট,সার্জারি বিভাগ।
এমন একটি সফলতা এমন রহস্যে ঘেরা ব্যক্তির নাম। যাঁর আগমন যেন শুধুই সফলতার আর বিদায় যেন রহস্যের সর্বোচ্চ ধাপের। জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল কলেজের ৪র্থ ব্যাচের (JRRMC-4), বাংলাদেশের মেডিকেল ইতিহাসের সেরা ছাত্রদের মধ্যে একজন, FCPS এর কোর্স কমপ্লিট করার ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম (সবচেয়ে কম বয়সে কোর্স শেষ করায় দ্বিতীয়)। মাত্র তিরিশের কোঠায় দাঁড়িয়েই সার্জন হিসাবে দেশের সেরাদের একজন। মেডিকেল ইতিহাস সেরা ছাত্রদের একজন। হয়তো প্রাপ্তির খাতায় কিছুই বাদ থাকতোনা। কেবল তো শুরু হয়েছিলো। তার আগেই থামিয়ে দিলেন নিজেকে। হ্যাঁ, বিদায় নিলেন আত্মহত্যার মতো একটা পথ বেছে নিয়ে। বিদায় নিলেন জ্বলে উঠার আগেই। হয়তো জীবনে বাইরের দিকটায় সাফল্যে জ্বলজ্বল করলেও ভেতরটায় ছিলো শূণ্যতার হাহাকার। তারপরও তাকে ইতিহাসের সেরাদের সাথেই রাখা হবে।
মনে করা হবে একজন তরুণ তুখোড় মেধাবী সার্জন হিসাবে। সেরারা তাদের বিদায়টা রহস্যে ভরপুর করে রেখে দিতে চায়। তিনিও সেক্ষেত্রে সফল। যাহোক বিদায় বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিভাবান ডাক্তারদের একজন। আশা রাখি আপনার আত্মা শান্তিতে থাকুক। স্বর্গবাসী হোক।

ডেন্টিস্ট ডাইরি

ডাঃ তৌহিদুর রহমান তৌহিদ, ৪২তম ব্যাচ, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

১."শুধু পায়ুপথের চিকিৎসালয়"
"শুধু মলদ্বারের চিকিৎসালয়"
"অর্শ,গেজ,ভগন্দরের চিকিৎসালয়"
"দাঁতের চিকিৎসালয়"
"মুখ গহ্বরের চিকিৎসালয়"
"দন্ত শেফালয়; কিলিং ফিলিং করা হয়"
দুইটা মহাগুরুত্বপূর্ন "পথ" [ইনকামিং এন্ড আউটগোয়িং] এর চিকিৎসা এক শ্রেণীর অসাধু মানুষেরা "স্ট্রিট ট্রিটমেন্ট" দ্যাট মিনস্ খাঁটি বাংলায় "পথের চিকিৎসায় পরিনত করেছে। আর এক শ্রেণীর জানলেওয়ালা,বুঝনেওয়ালা মানুষেরা "দুইটা" গুরুত্বপূর্ন "পথ"রে পথের মাঝে গিয়া "চ্যাগাইয়া" ওপেন করে দিচ্ছে।
খাড়ান! চ্যাগাইয়া ওপেন করার আগে বুইঝ্ঝা লন।"ঢুকানি" আর "বাইরানি"র এই দুইটা পথের ক্যান্সার এখন খুবই কমন হয়ে যাচ্ছে। এই দুইটা পথের সার্জারী এবং সার্জন দুইটাই গুরুত্বপূর্ণ। "ভাবিয়া চ্যাগাইও পথ, চ্যাগাইয়া ভাবিও না"।
২.
পেশার খাতিরে দৌড়েছি; কখনো ঢাকার এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত; কখনো ঢাকার বাইরে, জেলা সদর থেকে উপজেলা পর্যন্ত। পেশায় ডেন্টিস্ট হওয়ায় মানুষকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি, জেনেছি। পরিচয় হয়েছে অনেক উঁচু দরের মানুষ থেকে নিচু দরের মানুষ পর্যন্ত। ঢাকার সবচেয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠানের এক শিক্ষক বলেছিলেন-"আপনাদের দাঁত নিয়ে পাঁচ বছর পড়তে হয়? "মিরপুরের এক ব্যাংকারকে তার মেডিকেল হিসট্রিতে প্রেশার,ডায়াবেটিসের কথা জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন-"দাঁতের রোগের সাথে এগুলোর আবার সম্পর্ক আছে নাকি? "ফেবুর শিক্ষিত সমাজ দুনিয়ার সব খোঁজ রাখলেও এটাকে হাতুড়ি-প্লায়ার্সে সীমাবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও অনেক শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছি। -আর্টস,কমার্স পড়ে এটা পড়া যায় কি? -পলিটেকনিক পাশ করে পড়া যায় কি? ইত্যাদি
সবাইকে বলি;ভাই এইটা ডাক্তারির স্পেশাল বিদ্যা। চুল পড়লে ডাক্তার খোঁজেন,পুঁজ খসলে ডাক্তার খোঁজেন,পাছায় খাঁওজাইলে ডাক্তার খোজেন, নুনু কাটাইতে ডাক্তার খোঁজেন, চশমা পরতে ডাক্তার খোঁজেন। ৩২টা দাঁত দিয়ে খাইয়া খাইয়া যে চুল,পাছা,শরীর,নুনুর ডেভলপ করছেন তার যত্নে কি খোঁজেন? ডেন্টালিস? দাঁতের মেকানিকস্? নাকি ঝুনু হকার?

চিকিৎসকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল চাই

১. ডাঃ সাজিয়া আফরিন

ডাঃ আমেনা বেগম ছোটন,৪১তম ব্যাচ,সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি

-কিরে? কি করিস?
-(চমকে উঠে) না, তেমন কিছু না, এই একটু ফেসবুকে ঘুরাঘুরি করছিলাম, তুই কোত্থেকে ?
-যেখানে আমার থাকার কথা, হঠাৎ মনে হল, দেখে আসি তোরা কি করছিস।
-(আমি আমতা আমতা করে) দেখ,আমাদের সবার আসলে তোর কথা খুব মনে হয়, খুব বলি তোর কথা।-(মুচকি হেসে)তাই নাকি?
-(আরও বিব্রত হয়ে) আসলে হয়েছে কি, জানিস, আমাদের সবারই মনে ছিল ৩০শে নভেম্বরের কথা, তোর কথা, কিন্তু দেশের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছে, সবাই ওই নিয়ে খুব আপসেট ছিল, তাই আর বিশেষ কিছু (থেমে যাই, কথা খুঁজে পাই না আর)
-(স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে) এমন করছিস কেন, তোদেরকেত আমি কিছু করতে বলিনি, বলেছি?
- না বলিসনি, কিছু বলে যাবি, সে সুযোগ তোকে দেওয়া হয়নি। হঠাৎ করে সব (মৃদু দীর্ঘশ্বাসের শব্দে থেমে যাই)
- আমার জন্যে তোরা কি করবি? আমি সেধে জীবন দিতে যাইনি। আমি মরতে চাইনি। আমি পড়ালেখা করছিলাম, চাকরি করছিলাম, বিসিএস এর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তোদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমার সাদামাটা জীবন নিয়ে আমি বেশ ছিলাম, কিন্তু ওই রাতে-কোনদিন ভাবতেও পারি নি, আমাকে নিয়ে মানুষের মাথায় এমন কুচিন্তা আসতে পারে। পেপার-পত্রিকায় কতদিন কত মেয়ের এমন খবর পড়েছি, হঠাৎ নিজেই একটা খবর হয়ে গেলাম। আচ্ছা, বলত আমার জীবনেই কেন এমন আশ্চর্য দুর্ঘটনা ঘটতে গেল? মানুষ কত ভাবে মরে, আমাকে কেন এই অসম্মানের মৃত্যু মরতে হল? - থাক, বাদ দে এসব কথা। তুই কেমন আছিস? ওই জগতটা কেমন?
- (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) বুঝতে পারি না, সব কিছু কেমন থেমে আছে, এক অদ্ভুত শূন্যতা চারিদিকে।
- সেজাদি আপার সাথে দেখা হয়েছিল? রিপা, মুগ্ধ ভাই?
- হুম, হয়েছে। সেজাদি আপার কোন শান্তি নাই, ছেলেটার জন্যে কান্নাকাটি করে। বেচারি বেঁচে থাকতেও কষ্ট করেছে, এখনও ছেলের চিন্তায় শান্তিতে থাকতে পারে না। আমরা সবাই আছি, আমাদের মত। অপেক্ষা করি, কিসের অপেক্ষা, সে অপেক্ষা কখন শেষ হবে, তাও জানি না।
-সাজিয়া
-কি ?
-তুই আমাদের ক্ষমা করিস।
- ক্ষমা চাইছিস কেন? তোদের অপরাধ কি ?
-তোর জন্যে আমরা কিছু করিনি, তাই।
-আমার জন্যে কি করবি? বাংলাদেশের এতগুলো পুরুষ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? তাও অনেকেই দাঁড়িয়েছিল আমার পরিবারের পাশে। মানব-বন্ধন, প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল। এর বেশি করার সাধ্য হয়ত কারো ছিল না ।
-তবুও; এক ধরনের অপরাধ বোধ কাজ করে।
-কোন মানে হয় না । সত্যটা হল, এই ঘটনা তোর জীবনে ঘটতে পারত, আর আমি তোর মত এমন আজগুবি চিন্তা করতাম, কিছুই পরিবর্তন হত না।
-(চমকে উঠি; আমার জীবনে এমন কিছু!) হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস।

উপরের কথোপকথন আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। প্রথম লাইনটা বাদে। সাজিয়ার মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে আমাকে ফেসবুকে একটা মেসেজ দিয়েছিল,"কিরে,কি করিস?"আমি উত্তর দিয়েছিলাম,তার ২দিন পরে,"তোর নিউজ পড়ি,নিউজ হয়ে গেলি?"
৩০ নভেম্বর এক বছর হয়ে গেল। বাংলাদেশের লাগাতার মানুষ পোড়ানোর নৃশংসতায়, ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে একজন চিকিৎসক হত্যার মামুলি ঘটনার কথা আমরা সাফল্যর সাথে ভুলে যেতে পেরেছি। এই বা কম কি ? তাই, এখনো ডাঃ রা নিশ্চিন্ত মনে ক্লিনিকে ডিউটি করে। যে কেউ এসে তাদের মারধর করে যেতে পারে। মেরেও ফেলেছে কয়েকজনকে। আমরা মেনে নিতে পেরেছি। কি দরকার প্রতিবাদের? বাংলাদেশের মানুষের মূল্য আসলে কয় টাকা? পরিবারের লোকজন কাঁদে, গেলে শুধু তাদেরই যায়। চোখের পানির কোন মূল্য নেই। দক্ষিণখানের ব্র্যাকের ক্লিনিকে ডাঃ এর পোস্ট কখনো খালি থাকে না । ডিউটি ডাঃ মরে গেলেও না ।

২. ভুল চিকিৎসা

ডাঃ তানভীর শুভ,৩৪তম ব্যাচ, শেরে বাংলা এমসি(বরিশাল),সিএ,সার্জারি-৪,ঢাকা এমসি

পু-শের এম্বুলেন্সটা মিরপুর আধুনিক হাসপাতালের (প্রাইভেট) জরুরি বিভাগের সামনে থামল। এক ঝাঁক পোশাক পরিহিত বিভিন্ন Rankএর পু-শের ধরা ধরি করে একজন রোগীকে নামালেন। রোগীর অনেক চাপ আজ। শুক্রবারের দিন জুম্মার নামাজটাই না আজ মিস হয়ে যায় এটা নিয়ে টেনশানে আছে সাজ্জাদ। ডাঃ সাজ্জাদ এই হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার। স্ট্রেচার থেকে রোগীকে জরুরি বিভাগের বেডে শোয়ানো হল। ঠাণ্ডা মাথায় ডাঃ সাজ্জাদ রোগীর হিস্ট্রি নিলেন। রোগীর নাম আব্দুল বারি, পু-শের সাব ই-পেক্টার। ডিউটিরত অবস্থায় অসুস্থ বোধ করায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রেশার মাপলেন ডাঃ সাজ্জাদ। ভুরুটা একটু কুচকে গেলো। ২১০/১১০। আগে থেকে প্রেশারের ওষুধ খায় কিনা সে সম্পর্কে রোগী কিংবা তার এটেন্ডেট তথ্য দিতে পারলেন না।
ডাঃ সাজ্জাদ রোগীর পার্টিকে অবস্থা গুরুতর বুঝিয়ে তাকে NICVD তে নিয়ে যেতে বললেন। প্রেশারটা কমাতে মুখে একটা Lasix(40mg) এর ট্যাবলেট খেতে দিলেন। কিছুক্ষণ পর রোগী সুস্থ অনুভব করায় রোগীর লোকজন তাকে NICVD দ্রুত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা শুরু করলো। জরুরি বিভাগের আরেক ডাক্তার মারুফ পুনরায় প্রেশার মেপে দেখেন এখনো প্রেশার ২০০/১০০। তাই দেরি না করে তিনি ৩ফোটা nificap gel রোগীর জিহবার নিচে দিয়ে দিলেন আর কাউন্সিলিং করে দ্রুত রোগীকে নিয়ে যেতে বলেন। এ্যাম্বুলেন্স করে সাব ই-পেক্টার বারিকে NICVD এর পথে নিয়ে যাওয়ার কালে তিনি মারা যান। একে পু-শের মরেছে তার উপর সাথে থাকা এক সাংবাদিক মনে করিয়ে দিলেন শেষের ওষুধটা খাওয়ানোর কারণেই নাকি রোগীটা মারা গিয়েছে। ঐটা ভুল ওষুধ ছিলো। আর যাবে কোথায় চিকিৎসকের ভুল ধরায় ওস্তাদ সাংবাদিক আর আজন্ম হুজুগে চলা পু-শ মিলে ঐ দুই ডাক্তারের পিণ্ডি চটকানোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

এক ডাক্তারকে জরুরি বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে সবে জুম্মার নামাজ পরতে রওয়ানা দিচ্ছেলেন ডাঃ সাজ্জাদ। আচমকা ইবলিসরূপী পু-শ আর তার পিছনে থাকা শয়তান রুপী সাংবাদিক এসে দুই ডাক্তারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে থানাতে ধরে নিয়ে গেল। অভিযোগ ভুল চিকিতৎসায় রোগীর মৃত্যু। ৩০২(খ) ধারায় মামলা দিয়ে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে বসলো আদালতের কাছে। দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর হল। দুই ডাক্তারের আত্মীয় বন্ধুরা কিছু বুঝে উঠার আগেই মামলা শক্ত করতে পু-শ রিমান্ডের আবেদন করে। কোর্ট সেটা মঞ্জুরও করে।

হাজত খানার স্যাঁতস্যাঁতে রুম। পাশেই প্রসাব খানা থেকে ভকভক করে আসছে এমোনিয়ার গন্ধ। ডাঃ মারুফ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। আর যাই হোক এই দেশে থাকলে আর ডাক্তারি করবেন না। এই নিমকহারাম মানুষগুলোর জন্যে তার এই অবস্থা। একপাশে ফ্লোরে বসে আছেন ডা সাজ্জাদ। বিড়বিড় করে আউড়ে যাচ্ছেন, হে খোদা ডাক্তার হয়ে কি পাপ করলাম ? কেনো আজ এই গারদে? আমি কি চিকিৎসা ভুল না শুদ্ধ দিয়েছি তা বোঝার ক্ষমতা আছে কেবল তোমার আর একজন ডাক্তারের। তাহলে কিভাবে পু-শের আর সাংবাদিক আমার ভুল ধরে? তারা কি এই ওষুধগুলোর নাম, ব্যবহার, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানে? নাকি তারা এমবিবিএস পাশ করে এসেছে? ডাঃ সাজ্জাদের বিড়বিড় করে বলা প্রশ্নগুলো এমোনিয়ার গন্ধে মৌ মৌ করা গারদের দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়ে শুধু ফিরে আসে। দীর্ঘ একটা রাতের জন্যে তারা প্রস্তুত হতে থাকে। আজ তাদের রিমান্ড রজনী।

চোর , কিংবা খুনিকে রিমান্ডে নিয়ে পু-শের কি জিজ্ঞেস করে ? চুরির পরিকল্পনা কিভাবে হল, তাদের নাম কিংবা আর কেউ খুনের সাথে জড়িতো কিনা? এই সব তো? খুনি কিংবা চোর এর চরিত্র এবং তাদের পরবর্তী প্ল্যান কি হতে পারে এই বিষয়ে পুলিশের ভালো জানাশোনা আছে।
আচ্ছা তারা এই দুই ডাক্তারকে রিমান্ডে ডান্ডা মারতে মারতে কি জানতে চাইবে ? Lasix tablet রোগীর পেটে গিয়ে পেট ফুটা করে দিয়েছে, আর তাই সে মারা গেছে, তাই নারে হারামি? অথবা nificap gel ২ ফোটার সাথে এক ফোটা বিষ মিশিয়ে খাওয়াইয়া আমাদের পু-শের ভাইটারে মাইরা ফালাইছস, তাই না হারামজাদা ডাক্তার?

কিছুক্ষণ আগে একজন পল্লবী থানায় গিয়ে দেখে আসলেন দুই অসহায় ডাক্তারকে। সাজ্জাদ ছলছল চোখে বলেই ফেলে কেউ নাই ভাই আমাদের পাশে, আর মারুফ অধিক শোকে কাতর হয়ে কথাই বলল না। মারুফের ঠোঁটের কোনে লেগে ছিলো বিদ্রুপের হাসি , সেই হাসির ভাষা পড়ে নিতে একটুও কষ্ট হল না। হে আমার প্রিয় স্বজাতি তুমিও একদিন আমার অবস্থায় পড়বে, তখন আমার মতো অসংখ্য মারুফ আর সাজ্জাদ এই সময় বসে চেম্বারের বাতি জ্বালাবে আর তোমার খবরটা দেখে একটু হা-হুতাশ করে কোন দল পরেরবার ক্ষমতায় আসবে সেই আলোচনায় বুদ হয়ে যাবে ।

৩. ডাঃ গৌরাঙ্গ

ডাঃ মাহবুব হোসেন,১৭তম ব্যাচ, শিক্ষানবিশ চিকিৎসক,খুলনা এমসি
ডাঃ গৌরাঙ্গ নিজ চেম্বারে খুন হয়েছেন। এটাকে অবশ্য খুন বলা উচিৎ হবে না, বরং 'শাস্তি' বলা যেতে পারে। ক্লিনিকের এক পুরুষ এসিসটেন্ট জনৈক নার্সকে উত্ত্যক্ত করে আসছিল, ডাঃ গৌরাঙ্গ উত্ত্যক্তকারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার অপরাধটি করেছিলেন। আইনের শাসন যে সমাজে অনুপস্থিত, সেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া একটি অপরাধ। গৌরাঙ্গ তার অপরাধের শাস্তি পেয়েছেন। উত্ত্যক্তকারী তাঁকে কুপিয়ে শাস্তি কার্যকর করেছে। পত্রিকার সাংবাদিকগণ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সেই নার্সের সাথে গৌরাঙ্গবাবুর মুখরোচক সংবাদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেরকম কিছু না পাওয়ায় তারা কিছুটা হতাশ, তবে তাদের দমে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। সত্য খবরের চেয়ে মিথ্যার কাটতি বরাবরই বেশি, কাজেই পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর মত দুয়েকটা 'নিউজ' উৎপাদন করতে তাদের সমস্যা হওয়ার কথা না। ডাক্তারেরা কসাই হলেও তাদের গলার জোর সুবিধার না। দেশের কয়েকটি জায়গায় ডাক্তারেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে, কসাইশ্রেণীর এই মানববন্ধনে মিডিয়া কিছুটা বিরক্ত। 'কসাইকেও জবাই হইতে হইবে' এই সহজ বাস্তবতা কেন ডাক্তার সমাজ মেনে নিতে পারছে না, সেটা মিডিয়ার কাছে রহস্যময় ব্যাপার। সঙ্গত কারণেই মিডিয়া ডাঃ গৌরাঙ্গের হত্যাকাণ্ড এবং তার প্রতিবাদের সংবাদ ফলাও করে প্রচার করেনি। একই সময়ে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত কিছুটা অসুস্থ ছিলেন,
তার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকটি গণমাধ্যম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশে ডাক্তার একটি সুলভ, ক্রয়যোগ্য এবং ঘৃণ্য প্রাণী। এদের সুখ-দুঃখ গুরুত্বের সাথে নেয়ার কোন কারণ নেই।
হেমন্তের রাতে শীতের আগমনী বার্তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ডাঃ গৌরাঙ্গ যেমন কক্ষে খুন হয়েছেন সেরকমই একটি কক্ষে আমি বসে আছি। রুমের সামনে লেখা 'ডিউটি ডক্টরস রুম', রাত বাড়ার সাথে সাথে হাসপাতালে রোগীর ভিড় কমতে থাকে, ব্যস্ত রুমটাতে এক সময় ভর করে সীমাহীন একাকীত্ব। রুমের জানালা দিয়ে হালকা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। রুমের লাইট নিভিয়ে দেয়ার পর অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম। পড়ন্ত জোছনার আলো এসে আমার গায়ে পড়ল, হাসপাতালের পাশেই প্রকাণ্ড এক ছাতিম গাছে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে, শীতের হিমেল হাওয়ায় ছাতিম ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। অপার্থিব এই সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে স্রষ্টার করুণাধারাকে প্রবলভাবে অনুভব করলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাতাল জোছনা ছুঁয়ে অপেক্ষায় রইলাম, কখন কেউ একজন দরজার সামনে এসে ডাকবে, ডাক্তার আছেন? জোছনা, ছাতিমের ঘ্রান, হিমশীতল হাওয়া পেছনে ফেলে স্টেথোস্কোপ হাতে রোগীর কাছে ছুটে যাবো, স্রষ্টার করুণাধারার স্নিগ্ধ পরশ হয়তো স্পর্শ করবে সেই অসুস্থ প্রাণটিকেও।
আমি কান পেতে রই।

৪. ডাঃ মাখলুকুর রহমান মুরাদ

মোঃ টিপু সুলতান,১৯তম ব্যাচ,ফরিদপুর এমসি

অনেকেই হয়তো বলবে যে, মাত্র একজন ডাক্তার মারা গেছে, এখনো তো অনেক ডাক্তার জীবিত আছে। এভাবে বাংলাদেশে প্রতিদিনই কত শত মানুষ যাচ্ছে, তাদের কেউ খোঁজ রাখেনা । আমি বলব একজন ডাক্তারের মৃত্যুকে কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে বিবেচনা করবেন না। একজন ডাক্তারের মৃত্যু মানে ৪০০০জন চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া (বাংলাদেশে ৪০০০ জন লোকের বিপরীতে মাত্র ১ জন রেজিস্টার্ড ডাক্তার)। একজন ডাক্তারের মৃত্যু মানে কতগুলো ভবিষ্যৎ ডাক্তারের তাঁর কাছ থেকে কিছু শেখার সুযোগ নষ্ট হওয়া (কারণ ডাঃ মাখলুকুর রহমান মুরাদ ভাই গণস্বাস্থ্য ভিত্তিক মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের শিক্ষক ছিলেন)। এই ডাক্তার যে বাবা মায়ের সন্তান ছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তারা সন্তানহারা হল, হয়তো তাদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন ছিল তাঁদের এই সন্তান। হয়তো তার বাবা মা স্বপ্ন দেখতেন তাঁর ছেলে বড় হয়ে মস্ত বড় ডাক্তার হবে। হয়তো তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের এই স্বপ্নেরও অপমৃত্যু ঘটলো। ডাঃ মুরাদ যার স্বামী ছিলেন, সে হয়তো তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বনকে হারালো (তার বিয়ে হয়েছিলো গত বছর)। এভাবে আর কত ডাক্তারের অপমৃত্যু ঘটবে? আর কত ডাঃ মিলন, ডাঃ গৌরঙ্গ, ডাঃ পলাশ, ডা. নারায়ণ চন্দ্র দত্ত নিতাই, ডাঃ সাজিয়া আফরিন ইভা, ডাঃ শেজাদী আফসা, ডাঃ মুরাদ মারা গেলে এসব অতৃপ্ত আত্মাদের (খুনিদের) শাস্তি হবে ? আমরা ডাক্তার সমাজরা আর কত মুখ বুজে সহ্য করবো ? এদেশের মানুষরা এখনো ডাক্তারদের মর্যাদা দিতে শিখল না। শিখবে শিখবে, যেদিন ডাক্তাররা তাদের দাবী আদায়ে কঠোর হবে সেদিন বুঝবে কতো ধানে কতো চাল। দেশে ডাক্তারদের মূল্য বুঝাতে ডাক্তারদের রাজনীতিবিদদের মতো সহিংস কর্মসূচীতে যাওয়ার দরকার নাই। পুরো দেশের ডাক্তাররা মাত্র একদিনের কর্মবিরতিতে (অহিংস আন্দোলন) গেলেই বুঝতে পারবে। কত রোগী যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তারপর সরকারও ডাক্তারদের ন্যায্য দাবী দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হবে।
আমরা ডাক্তাররা মানবতার কথা চিন্তা করে এত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা। কিন্তু কত দিন আর পরের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে ডাক্তাররা নিজেদের জীবন দিবে? কিছুদিন আগে ডাঃ সাজিয়া মারা গেছে, তাঁর হত্যার বিচার আজ পর্যন্ত আমরা করতে পারিনি। গত পরশু ডাঃ মুরাদ মারা গেল। তাঁর হত্যার সুষ্ঠু বিচার যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে এই মানুষরূপী হায়েনারা লাই পেয়ে কাল আমাকে নয় আপনাকে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলবে। কারণ তারা জানে যে এই হত্যাকাণ্ডের আর বিচার হবেনা। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, ডাক্তাররা এই সস্তা মনবতার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মূল্যবান জীবন বিপন্ন করবে নাকি? সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়াবার, নিজেদের ন্যায্য দাবী আদায়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবার। আসুন আমরা ডাক্তাররা এই অন্তত একটা ইস্যুতে সবাই এক হয়ে যাই।

৫. ইতিহাসের চিকিৎসক

আসিফ মজুমদার, ৫ম ব্যাচ, নোয়াখালী এমসি

সময়টা ১৯৫২।ভাষা নিয়ে দেশ উত্তাল। আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু যে জায়গাটা তার নাম 'ব্যারাক'। তখনকার ঢাকা মেডিকেলের ডরমেটরিটা এই নামেই পরিচিত ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ইমার্জেন্সী গেটের কাছে আমতলায় পুলিশের গুলিতে রঙ্গীন হয়েছিল মাটি। সারাদিন আন্দোলন করেও ২২ আর ২৩ তারিখ দিন রাত জেগে সেখানেই কিছু মানুষ গড়ে তোলে বাংলার প্রথম শহীদ মিনার।

এই মানুষগুলোর পরিচয় জানেন ভাই? ডাক্তার,এক নাম্বারে কসাইগুলো নিজের মেডিকেলের উন্নয়ন কাজের জন্য রাখা ইট,বালি,সিমেন্ট আর নিজেদের ঘাম দিয়ে গড়ে তুলছিল স্বাধীনতার প্রথম স্তম্ভ।

এবার সময় '৬৯।আবার গুলি চলল ইমার্জেন্সি গেটে। নিহত হলেন ছাত্রনেতা আসাদ। আসদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে ততক্ষণাৎ মিছিল করল একদল নির্ভীক তরুণ,বন্দুকের নল ঠেকাতে পারেনি তাঁদের। এই মানুষগুলোর পরিচয় জানেন ভাই? ডাক্তার, একমাত্র স্থান যাদের দাঙ্গা পুলিশের বুটের তলা।

১৯৭১ এ শিক্ষাবিদদের পর সবচাইতে বেশি শহীদ হয়েছিল কোন পেশার লোক জানেন? ডাক্তার। চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীরাও যাদের গায়ে হাত তোলে অবলীলায়। '৯০ এর ২৭শে নভেম্বর স্বৈরাচারী আন্দোলনের চেহারা পালটে দিয়েছিলেন কোন মানুষটা জানেন? বলতে লজ্জা লাগে,ডাক্তার মিলন। সেই প্রজাতির একজন যাদের লাশ পুকুর-ডোবায় ভাসে মৃত কুকুরের মত।

চে গুয়েভারার টি শার্ট আর ব্যাগ ঝুলিয়ে তো খুব ঘোরা হয়। স্বাধীনতার প্রতীক এ মানুষটাও নাকি ডাক্তার! কি আশ্চর্য! যুগে যুগে মানবতার হাল ধরে রেখেছে যে মানুষগুলো, তাদের বুটের নিচে পিষছেন ভাল কথা। এদের পদদলিত করে নিজের মানবাধিকারটা ধরে রাখতে পারবেনতো? আপনি নিশ্চিত তো দেশের ক্রান্তিলগ্নে এই মানুষগুলো যেভাবে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গায় আপনি দাঁড়াতে পারবেন?
আর মৃত্যুর পথ থেকে প্রতিদিন হাজারো জীবনকে ফিরিয়ে আনার গল্প আমি বাদই দিলাম।

যদি পারেন তাহলে ওয়েলকাম। আরো জোরে বুট চালান, পিষে ফেলেন এই প্রজাতিকে। সবচে ভাল এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার, সব সাফ! শুধু একটা রিকোয়েস্ট,পরে আবার মাথা চাপড়াবেন না ।

৬. চিকিৎসকের অবহেলায় রুগীর মৃত্যু এবং চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হামলা-মামলা।

ডাঃ শামীম রেজা,৫ম ব্যাচ, ফরিদপুর এমসি, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সোনাইমুড়ী।

খবরের কাগজ খুললে প্রায়ই দেখা যায়, চিকিৎসকের অবহেলায় রুগীর মৃত্যু। এবং এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ও হাসপাতাল, হামলা-মামলার শিকার। কিন্তু, আমরা অনেকেই জানিনা যে, অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ আমলে নেয়া, তদন্ত এবং গ্রেফতারের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০৪(ক) ধারায় স্পষ্ট ভাবে কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে।
এসব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছেঃ
১. অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত কোনো মামলা গ্রহণের পূর্বে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করবেন। তার কাছ থেকে অবহেলা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র মামলা আমলে নেয়া বা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যাবে।
২. থানায় এজাহার পাওয়ার পর চিকিৎসকের অবহেলার অভিযোগ তদন্ত করতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি কমিটি গঠন করতে হবে। ওই কমিটির কাছ থেকে অবহেলা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হলেই কেবলমাত্র মামলা আমলে নেয়া বা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা যাবে।
৩. চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, হাসপাতাল বা ক্লিনিক যদি হামলার আশঙ্কা করেন তাহলে চাহিদা অনুযায়ী পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি অধ্যাপক মাহমুদ হাসানের দায়ের করা এক রিট আবেদনে, অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আগে এসব নির্দেশনা কেন মানা হবে না, তা চ্যালেঞ্জ করে, হাইকোর্টে একটা রিট আবেদন করা হয়। গত ১৩.০১.২০১৪ তারিখে রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে, উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণের বিষয়ে, আদালত রুল জারী করেন।
রুলে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক)ধারায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ আমলে নেয়া, তদন্ত এবং গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কেন উল্লেখিত নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়।
আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাস্থ্যসচিব এবং পুলিশের মহাপরিদর্শককে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

কোয়াক হান্টার

ডাঃ অনুজ কান্তি দাশ, ১৩তম ব্যাচ, খুলনা এমসি, লাখাই ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, হবিগঞ্জ

প্রথমেই BMDC নীতিমালার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ।
নিবন্ধনযোগ্য মেডিকেল চিকিৎসা ডিপ্লোমা
১৫। (১) বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোন মেডিকেল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত, ৩ (তিন) বৎসরের কম নহে এইরূপ সময়ব্যাপী, মেডিকেল চিকিৎসা-প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর উক্ত মেডিকেল চিকিৎসা ডিপ্লোমাধারী মেডিকেল সহকারীগণ এই আইনের অধীন কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত হইবার যোগ্য হইবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ডিপ্লোমাধারী কোন মেডিকেল সহকারীকে এই আইনের অধীনে উক্ত ডিপ্লোমা নিবন্ধনের জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে হইবে।
(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কাউন্সিল, নির্ধারিত মানদন্ড ও নীতিমালার আলোকে যোগ্য বিবেচনা করিলে, আবেদনকারীর উক্ত ডিপ্লোমা নিবন্ধন করতঃ তাহাকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে এবং পঞ্চম তফসিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম উক্ত ডিপ্লোমাসহ অন্তর্ভুক্ত করিবে।
(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত মেডিকেল সহকারীগণ কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালার অধীনে মেডিসিন, সার্জারী এবং মিডওয়াইফারী পেশায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

নিবন্ধন ব্যতীত এলোপ্যাথি চিকিৎসা নিষিদ্ধ
২২। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন নিবন্ধন ব্যতীত কোন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিতে, অথবা নিজেকে মেডিকেল চিকিৎসক বা, ক্ষেত্রমত, ডেন্টাল চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন না।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব বা নিবন্ধনের দণ্ড
২৮। (১) যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় লইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে একজন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক বা স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসক হিসাবে এই আইনের অধীনে নিবন্ধন, অথবা নিবন্ধন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ, অথবা মিথ্যা বা প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন অথবা মৌখিক বা লিখিতভাবে উক্তরূপ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন)বৎসর কারাদণ্ড অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারী ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত দণ্ডে সমানভাবে দন্ডনীয় হইবেন।
(৩)এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত না হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে এই আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একজন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক বলিয়া প্রতারণা করেন, অথবা প্রতারণামূলকভাবে তাহার নাম বা পদবীর সংগে নিবন্ধনকৃত মর্মে কোন শব্দ, বর্ণ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করেন, তাহার মিথ্যা পরিচয়ের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি প্রতারিত না হইলেও, তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ১ (এক)লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। ভূয়া পদবী, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ
২৯। (১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোন মেডিকেল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক এমন কোন নাম, পদবী, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করিবেন না যাহার ফলে তাহার কোন অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেহ মনে করিতে পারে, যদি না উহা কোন স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা বা স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা হইয়া থাকে। ন্যূনতম এমবিবিএস অথবা বিডিএস ডিগ্রী প্রাপ্তগণ ব্যতিত অন্য কেহ তাহাদের নামের পূর্বে ডাক্তার পদবী ব্যবহার করিতে পারিবেনা।

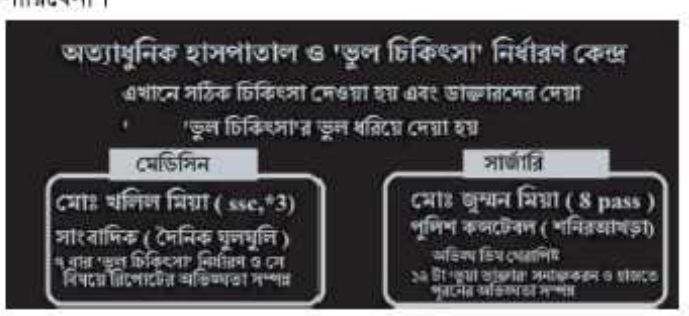

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত অপরাধ অব্যাহত থাকিলে, প্রত্যেকবার উহার পুনরাবৃত্তির জন্য অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে, বর্ণিত দণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে, দণ্ডনীয় হইবেন।

প্ল্যাটফর্ম পত্রিকায় আপনার এলাকার এসব হাতুড়ে ডাক্তারদের তথ্য ও ছবি পাঠান

ননমেডিকেলদের জন্যঃ অষ্ট্রেলিয়ান রোগী বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ গোলাম সারোয়ার,৮ম ব্যাচ,ফরিদপুর এমসি ইমার্জেন্সি মেডিকেল রেজিস্ট্রার,কুইন এলিজাবেথ-২ হসপিটাল,ব্রিসবেন,অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্টগুলো প্রায় সবসময়ই খুব ব্যস্ত থাকে, মাঝে মাঝে এমনও হয় কোনো কোনো রোগীকে ৪-৫ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ডাক্তারের দেখা পাওয়ার জন্য। যদিও সব ধরনের রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় না। এখানে আমরা রোগী দেখি কোন রোগীর চিকিৎসা আগে দরকার তার ভিত্তিতে। রোগী আসার পর নার্স দেখে তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরি দেয়, ১-৫ পর্যন্ত, এক হল ইমিডিয়েটলি দেখতে হবে, দুই- ১০ মিনিট এর মধ্যে, তিন-আধঘন্টার মধ্যে, চার- ১ ঘন্টা , আর পাঁচ নাম্বার ক্যাটাগরি ২ ঘন্টার মধ্যে দেখার কথা। আনেক সময় ব্যস্ততার কারণে এই নিয়ম মানা সম্ভব হয় না। তাই ননআর্জেন্ট রোগীদের (ক্যাটাগরি ৪-৫) অনেক সময়ই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয়। আপনাদের সাথে দুটো ঘটনা শেয়ার করছি।
ঘটনা-১
এইরকমই একটা রোগী দেখলাম কয়েকদিন আগে, বেচারা পেটে ব্যথা নিয়ে প্রায় ৫ ঘন্টা অপেক্ষা করেছে। তাই যখন দেখা শুরু করলাম প্রথমেই সরি-টরি বল্লাম, আপনি পেটে ব্যথা নিয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, আসলে আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম। ভদ্রলোক একটুও বিরক্ত না হয়ে আমাকে যা বললো তা বাংলা করলে অনেকটা এরকম-" না না কি যে বলেন, আমি জানি, আমার চেয়েও জরুরি রুগী নিয়ে আপনারা ব্যস্ত ছিলেন, আপনি বললে আমি আরও কয়েক ঘন্টা ওয়েট করতে পারি। পড়ে কথা প্রসঙ্গে জানলাম, ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা।
ঘটনা-২
৮০ বছর বয়সী এক বুড়ি, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। বুড়িকে ভর্তির কথা বলতেই আমাকে বলে, ডক্টর, তুমি কি শিওর যে আমার চেয়ে বেশি অসুস্থ কোনো রুগীর বেডটা আমি ব্লক করছি না ? যখন ভদ্রমহিলাকে বোঝাতে পারলাম যে আমাদের বেশ কয়েকটা বেড ফাঁকা আছে এবং উনার ভর্তি হওয়াটা খুব জরুরী তখনই উনি রাজী হলেন । বুড়ি আমাকে আরও বললো, সে জানে ডক্টরদের সময় খুব ভ্যালুয়েবল, তার কাছে মনে হচ্ছে, হসপিটালে এসে সে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে!
পাদটীকাঃ
এই ঘটনা দুটোর মাধ্যমে আমি এটা বলতে চাই নাই যে, অস্ট্রেলিয়ানরা খুব ভালো মানুষ, এর চেয়ে, অনেক অনেক ভালো মানুষ বাংলাদেশে আছে। আমি এই জন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে, এরা ডাক্তারদেরকে যে কতো সম্মান করে এটা বোঝানোর জন্য। এই রোগীদের কাছে কিন্তু মনে হয় নাই, আরেক রোগী আমার পড়ে এসে, আগে ডাক্তার দেখাল কিভাবে বা ডাক্তার মনে হয় বসে বসে গল্প মারছে বা কোন বাণিজ্য করছে, কারণ তারা জানে আমরা সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম । আর এই সম্মান কিন্তু এমনি এমনি আসে নাই, এসেছে নিজের পেশার প্রতি সম্মান, সততা এবং ভালোবাসার ফলে। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশে এখনো বেশিরভাগ চিকিৎসকদেরই এই গুণগুলো আছে, কিন্তু গুটি কয়েক চিকিৎসক নামের সুবিধাবাদীদের জন্য সকল চিকিৎসকরাই অসন্মানের শিকার হচ্ছেন। এমনকি মেডিকেলের যে ছাত্রটি কালকে পাশ করে আজকে ইন্টার্নী করছে তাকেও শুনতে হচ্ছে কসাই ডাক। তাই শুধু সাধারণ মানুষ আর সাংবাদিকদের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে , চিকিৎসক নামের এইসব সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই হয়তো বাংলাদেশী চিকিৎসকেরা ফিরে পেতে শুরু করবেন তাদের হারানো সম্মান।

ভ্যাসলিনিয় ভালোবাসা

ডাঃ মোঃ আশরাফ আলি নাজমুল,৪৪তম ব্যাচ,ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

গতকাল সকাল। সময় ৮ টা। সাত সকালেই পৌঁছে গেলাম পিজির লাইব্রেরিতে। প্রতিদিনের মত পিছনের কোণার দিকের জায়গায় গিয়ে দেখি,আমি প্রতিদিন যেখানে বসি সেখানে বসে আসে নিউ পাবলিক। পাশের জায়গাটাও বই রেখে বুক করেছে। এই শীতের মধ্যে পরে এসেছে টি শার্ট। কাপঁছে ঠক ঠক করে। খুব সকালে এলাম,সিটটা যাতে পাই, কিন্তু আগেই বেদখল হল,মনটা খারাপ !
ওই জায়গার ক্যামন যেন ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। বিপরীত দিকে বসলাম । কিছুক্ষন পরেই আপুটা এসে হাজির। এসে বসেই ঝাড়ি শুরু।
"ওই তোমার কি আক্কেল কোন কালেই হবে না?"
ভাইয়াটার বিস্মিত উত্তর" আমি আবার কি করলাম?"
"এই ঠান্ডায় এইটা কি পরে এসেছ? তোমার মাথা কি ঠিক আছে?"
"বুঝি নাই যে এতো ঠাণ্ডা লাগবে"
"এই নাও আমার চাদর পর"
"ধুর এইটা লেডিস চাদর,পরলে মানুষে কি বলবে?"
"তোমারে আমি এইটা পরতে বলসি, পরো ।"
ঝাড়ি খেয়ে ভাইয়াটা বিডালের মত মিউ মিউ করে লেডিস চাদর গায়ে দিয়ে বসল ।
"এই তোমার ঠোঁট ফাটসে ক্যান ? কাল না বললাম লিপ জেল দিতে?"
"মনে ছিল না ।"
"বের কর । আমার সামনে দাও ।" "আনি নাই"
"আনো নাই মানে কি?"
আপু নিজের ব্যাগ থেকে লিপ জেল বের করে দিল ।
"এটা দাও । কাল যদি এই অবস্থা দেখি, খুন করে ফেলব "
ভাইয়া ভদ্র লোকের মত লিপ জেল লাগাতে গিয়ে খেল ধরা ।
"অই তোমার হাতের স্কিন ফাটা ক্যান ? তোমারে কতো বলসি না লোশন দিতে?"
"তুমি কি আমার কোন কথাই শুনবা না? আমি আজ তোমার সাথে পড়ব না । আমি দোতলায় যাই "
আপু ব্যাগ নিয়ে উঠতে উদ্দত,ভাইয়া হাত ধরে বসাল ।
"প্রমিজ কাল থেকে ভুল হবে না "
"সত্যি তো ?"
"হুম"
"তিন সত্যি বল"
"'তিন সত্যি বাবা"
"আমি তোমার বাবা না ।"
' ওকে তুমি আমার লিপ জেল ।"
'কি ঈঈঈঈঈঈঈঈ?"
না কিছু না । "
"এখন হাতে মুখে এটা দাও" (আপু ব্যাগ থেকে কিছু বের করল, বিপরীত পাশ থেকে দেখা গেল না)
"তুমি ব্যাগে ভ্যাসলিন লোশন নিয়ে ঘুর?"
'তোমার মত তাঁর ছিড়া লোক থাকলে, আমার ব্যাগে কম্বলও রাখতে হবে।।"
দুজনের হাসি, খুনসুটি। সাত সকালে মনটা ভাল হয়ে গেল। এমন শীত সবার জীবনেই আসুক, প্রেয়সীর উষ্ণ চাদর, লিপ জেল , আর ভ্যাসলিনিয় ভালবাসায় ভরে উঠুক সবার জীবন। সামনে এক্সাম ভাই, যত শীতই আসুক,পরেন ধুমাইয়া। কেউ লিপজেল না দিক,সুফিয়ানের পানি চা আপনার রসদ যোগাবে। হিম শীত সকালে শুভ কামনা সবার জন্য ।

হোস্টেল লাইফ:ডিম সমাচার

সুলতানা জাহান,৩য় ব্যাচ,কক্সবাজার এমসি

উৎসর্গঃ পৃথিবীর সকল হোস্টেলবাসী!!
ওগো ডিম খেতে খেতে আমি ক্লান্ত!
দুদিন পর নিজেকে যদি
ডিমের ভেতর আবিষ্কার করি
বলো সে দায়ভার নেবে কে ?
ওগো আর কত ডিম খেলে একটা জীবন ডিমে ডিমে সয়লাব হবে
সকালে ডিম দুপুরে ডিম রাতে ডিম!
কত গৃহপালিত মুরগী পাখির অভিশাপ বয়ে চলেছে এই হোস্টেল জীবন ?
একেকটি কুসুম একেকটি নাদুস নুদুস মুরগীর ছানা
অথবা একটি মোরগ অথবা একটি মুরগী
অথবা শতশত মোরগ মুরগী।
তাহলে কি দাড়ায় বলো?
ডিম সেদ্ধ করো ভাজো পোড়ো
তাতে একটি নয়
লক্ষ লক্ষ মোরগ মুরগীর মৃত্যু ঘটে ।
এই শতকের যে কোন একদিন মুরগীর দল
ডিম না পাড়া হরতাল দেবে
চলবে বিক্ষোভ মোরগদের
রাস্তায় রাস্তায় হবে আন্দোলন মিছিল সমাবেশ!
চলবে জ্বালাও পোড়াও !
দেশের স্বার্থে তবে কেন হোস্টেল ডাইনিংয়ে
ডিম নিষিদ্ধ করা হবেনা মাননীয় আদালত
ডিম খেতে খেতে এই মর্মে রিট জারি হোক !

জীবন স্মৃতিঃ মুগ্ধ

ডাঃ নাকিব শাহ আলম,৪০তম ব্যাচ, সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি,এনেস্থেশিওলজিস্ট

মুগ্ধ'র সাথে আমার প্রথম পরিচয় এখনো মনে আছে। আসলে আচার আচরণে, পোশাক-আশাকে কথা বার্তায় ও এমনি অন্যরকম একজন মানুষ ছিল, আমার মনে হয় ওর সাথে প্রথম পরিচয় কম বেশি সবারই মনে থাকবে। হোস্টেল এ প্রথম উঠবার পরে থেকেই ওর কার্যকলাপ আমি দূর থেকে দেখেছি। কথা হয়নি তখনো, দেখতাম জিনস/বাগী জিনস পরে ঘুরে, বিড়ি ফুঁকে, সানগ্লাস আর একটা ক্যাপ থাকে হাতে বা গেঞ্জিতে ঝোলানো। কথা হয়নি, কারণ সদ্য পরিবার ছেড়ে প্রথম বারের মত বাইরে আসা, কিছুটা দিশেহারা, মুখচোরা আমার জন্য সে ছিল, Out Of My League. সেই ছেলের সাথে কিভাবে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম কে জানে।

২০০২ সাল, আগস্ট মাস। সিলেট মেডিকেলে নতুন, উঠেছি শামসুদ্দিন হলের সি ৪ রুমে। অডিও সিডি তখনো এত সস্তা হয়নি, গান শুনতে তখনো ক্যাসেটই ভরসা। আমার ছিল প্রায় শ পাঁচেক অডিও ক্যাসেট, যার অধিকাংশই ইংরেজি। ক্যাম্পাসে মুগ্ধ'র চেয়ে বেশি বা সমান গান শোনা ছেলে মনে হয় তখন শুধু আমিই ছিলাম। সিলেটে আসবার সময় সে ক্যাসেট ভাণ্ডারের কিয়দংশ একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছিলাম। একদিন সেই ব্যাগ ঘাঁটছি, রুমে বসে, হঠাৎ করে রুমে ঢুকল মুগ্ধ, কিছুক্ষণ ক্যাসেট গুলার দিকে তাকিয়ে আমাকে বলল, "আরি ম্যান, তোমার সাথে

আমার জমবো, পরে কথা কমুনে"। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব তখনো হয়ে উঠেনি, কারণ মুগ্ধ তার এডাপ্টেশন এর প্রায় সুপার হিরো টাইপ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ক্যাম্পাসে রাইজিং স্টার, আর আমি হোমসিকনেস ভুলতে না পেরে প্রতি আইটেম শেষে প্রায় ৩/৪ দিন করে বাসায় কাটাচ্ছি।

প্রথম ওর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠা হয় সেকেন্ড ইয়ারে, রোজার সময়। ব্রেইন আইবল এ সাপ্লি খাওয়া আমরা মার্কা মারা কজন সিলেটে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারন আমাদের সাপ্লির ডেট ছিল ৭ রোজায়, বাকি ব্যাচ অটো নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। আমি, মুগ্ধ, নয়ন, তন্ময়, ফয়সাল, নাহিদ, রাশেদ আরো কয়েকজন বীরপুঙ্গব তখন ফাঁকা শামসুদ্দিন হলে দিন কাটাচ্ছি, কারণ ডিপার্টমেন্টাল হেড আয়েশা ম্যাডাম কোন ভাবেই সাপ্লির ডেট আগাবেননা। আমরাও তাই খাই দাই ঘুমাই করে দিন কাটাচ্ছি। এমন করতে করতে ৫ রোজা চলে এলো, তখনো কিছুই পড়া হয়নাই, হঠাৎ সন্ধ্যা বেলায় কোত্থেকে বই/খাতা নিয়ে মুগ্ধ চলে আসলো আমার রুমে, সে আমার সাথে পড়বে। কি পড়া বা আড্ডা হয়েছিল কিছুই মনে নেই, মনে হয় কিছুই পড়ি নাই, কারণ সাপ্লির দিনে আমি আয়েশা ম্যাডাম এর কাছে, আর মুগ্ধ জাকিয়া ম্যাডাম এর কাছে রি-সাপ্লি খেয়ে মুখ চুন করে বসে থাকলাম। রি সাপ্লির জন্য মন খারাপ না, মন খারাপ কারণ রি সাপ্লির ডেট দিয়েছে ১৪ রোজা, মানে আরো ৭ দিন। শামসুদ্দিন হল ততদিনে পুরা ভূতুড়ে জায়গা, রাতের বেলা শিয়াল ডাকে এমন অবস্থা। যাহোক ম্যাডামকে ভুজুং ভাজং দিয়ে সাপ্লির ডেট ১০ তারিখে আনানো হল, এইবার দুজনেই পাশ করলাম।

এরপর আবার আগের মত গ্যাপ পড়ে গেল। ফার্স্ট প্রফ এর পর আমি গিটার নিয়ে খুব মাতলাম, নিজের গিটার নাই, তাই তন্ময়, ফয়সাল, ডিনো এদের গিটার বিভিন্ন সময়ে রুমে এনে ধার করে বাজাতে বাজাতে বেশ হাত পাকিয়ে ফেললাম। আমার সাথে তখন আবার জুটলো মুগ্ধ, তার নিজের গিটার নিয়ে। দুজনের একসাথে গান বাজনা/জ্যামিং শুরু হল। জীবনের অন্যতম সুন্দর দিন ছিল সেগুলো।

মুগ্ধর বেশ বড় একটা গ্রুপ ছিল, যারা তার আশেপাশে সবসময়ই থাকতো। বিভিন্ন সময়ে সেই গ্রুপের মেম্বার পরিবর্তন হলেও, তাকে ঘিরে মোটামুটি ৬/৭ জনের ভিড় সবসময়ই দেখা যেত। সেই গ্রুপে আমাকে নিয়ে ঢোকাল সে। সিলেটে আসবার পর সত্যিকার অর্থে আমার কিছু বন্ধু বান্ধব হলও আমার, মুগ্ধ'র কল্যাণে। সিলেটে একটা লাইফ তৈরি হল, বাসায় যাবার প্রবণতা কমে আসলো। প্রতি সন্ধ্যায় আড্ডাবাজি/ গান বাজনা/ ঘুরাঘুরি/ একসাথে খাওয়া, মাঝে মধ্যে আইটেম উপলক্ষে একটু আধটু পড়া, সব মিলিয়ে দিন কাটতে লাগলো স্বপ্নের মত। এই যে সিলেট আমার এত প্রিয়, এত প্রিয় আমার এই ক্যাম্পাস, ক্যাম্পাসে এত এত স্মৃতি, যার টানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ও করছি সিলেটে, তার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান মুগ্ধর।

আমাদের দ্বিতীয় হল, আবু-সিনায় মুভ করবার পর আমাদের সময় প্রায় একসাথেই কাটতে লাগলো বলা যায়। ক্লাস শেষ করবার পরেই একসাথেই সময় কাটানো হত, ক্যাম্পাসে যাওয়া, শাবিপ্রবিতে যাওয়া, কর্ণার্ট এ যাওয়া, কলেজে যে কয়টা অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছি, সবগুলোয় সাথে মুগ্ধ ছিল। সিলেট মেডিকালের বাইরেও সাস্ট এবং লোকাল মিলিয়ে তার যে পরিমাণ বন্ধু ছিল, মনে হয়না আমাদের ক্যাম্পাসে আর কারো এত বড় সার্কেল ছিল। আমি কিছুদিন আগে (২০১১) মুগ্ধর সাথে সিলেট এসেছিলাম, কলেজ গেইটের সামনে রিকশা থেকে নামার পর থেকে পুরা কলেজ ঘুরবার সময় কত লোক যে তার সাথে কথা বলতে এগিয়ে এসেছিল, আমি গুনতে পারবোনা, জুনিয়র/ সিনিয়র/ টিচার/ হোটেল বয়/ ফটোকপির দোকান, ঐ এলাকায় হেন কেউ নেই যে তাকে চিনতোনা।
সেই সূত্রে আমার সাথে পরিচয় হয়ে ছিল, অক্লেশ/ অপু ভাই এমন অনেকে যারা মুগ্ধর খুব কাছের লোক ছিলেন। অক্লেশ/ আমি/ ফারদিল/ মুগ্ধ একসাথে আবু-সিনার ছাদে যে কত রাত গিটার/বাঁশি নিয়ে কাটিয়েছি, কে জানে। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন পার করবার সময় মনেই হয়নি যে এরকম সময়, সব সময় থাকবেনা, আমার কাছে মনে হচ্ছিল লাইফটাই এমন, এমন কেয়ার-ফ্রি আর মজা করবার জন্য।

বিসিএস দিয়ে সরকারী চাকরীতে ঢুকেছিল, কিন্তু অনেকের পরম আকাঙ্খার সরকারী চাকরী সে বছরখানেকের মধ্যেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, বিভিন্ন জায়গায় করাপশনের কাছে হার না মানতে পেরে। বান্দরবন ছিল ওর খুব খুব প্রিয় একটা জায়গা, কিছুদিন পরপরই চলে যেত সেখানে, ওখানকার আদিবাসীরা মুগ্ধকে নাম বললেই চেনে, এখনো আমাদের মেডিকেলের কেউ ওখানে গেলে মুগ্ধর নাম জিজ্ঞেস করলে এক নামেই চিনে ফেলে।

আসলে ওকে নিয়ে লিখতে বসলে শেষ করতে পারবোনা। শেষ একটা স্মৃতি লিখে রাখি, বন্ধু/ মানুষ হিসেবে সে কেমন ছিল বুঝাবার জন্য। খুব সম্ভবত ২৩ আগস্ট, ২০০৮। আমাদের ইন্টার্ন এন্ডিং এর ফিস্ট আর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের রাত। শেষবারের মত ৪০ তম ব্যাচের একসাথে হওয়া। চিন্তা করতেই খুব খারাপ লাগছিল সন্ধ্যা থেকে, রাত ৮/৯ টার দিকে আর ভাল্লাগছিলনা, কাউকে কিছু না বলে মোবাইলটা বন্ধ করে চুপচাপ এসে লাইট নিভিয়ে শুয়ে থাকলাম ফারদিল এর ফ্ল্যাট এ। আলো ঝলমলে সেই উৎসবের রাতে আমাকে আর কেউ খুঁজে ছিল কিনা জানিনা, মুগ্ধ কিন্তু কিছু পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল আমি নেই। আমি কোথায় সেটা জানারও কথা না। কিন্তু সে ঐ রাতেই, অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে আমাকে কলেজের ছাদ/ আবু-সিনার ছাদ/ খেয়া ঘাট আমাদের আড্ডাবাজির আরো বিভিন্ন জায়গা খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত হাজির হলও ফ্ল্যাট এ। নক শুনেই কিভাবে যেন বুঝলাম এ মুগ্ধই হবে। রুমে আসলো, কেউ কিছু না বলে অন্ধকারে চুপ চাপ বসে থাকলাম। রুমে গিটার ছিল, ওটা নিয়ে ও কিছুক্ষণ Yngwie Manlmsteen এর Dreaming গানটা বাজালো। ২০-২৫ মিনিট পর বলল, চল গিয়া একসাথে কান্দি। জীবনের কোলাহল ছেড়ে কষ্টে বা অভিমানে আপনি দূরে সরে আসলে আপনাকে নিজে থেকে টেনে আবার নিয়ে আসবে, এমন বন্ধু মানুষের জীবনে একজনই হয়, আমার সে এক বন্ধুকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি গর্বিত, আমি মুগ্ধর বন্ধু ছিলাম।

মুগ্ধ আজ একা, শুয়ে আছে, আজিমপুরে, ওর অনেক অনেক প্রিয় বান্দরবনেই এক সড়ক দুর্ঘটনায় ২০১২'র জানুয়ারীতে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি জানি আমার মত আরো অনেক মানুষের কৃতজ্ঞতা আর মুগ্ধতায় সে ভালই আছে ওপারের ঐ জীবনটায়। আমার বন্ধু মুগ্ধ, আমার জীবনে আর নেই, এটা আমারই শুন্যতা। তুই ভাল থাকিস, আবার দেখা হবে।"

অবিশ্বাস্য এপেন্ডিকস

রজত দাশগুপ্ত,কে-৬৬, ঢাকা এমসি

১৯৬১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের অভিযাত্রী দলের একমাত্র সার্জন ছিলেন ডা. লিওনিদ রোগোজভ। ১৯৬১ সালের ৩০ এপ্রিল। রোগোজভ পেটে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করলেন এবং প্রচণ্ড জ্বর এল। তিনি পরীক্ষা করে বুঝলেন তার এপেনডিসাইটিস হয়েছে এবং যেকোনো সময় এপেনডিক্স ফেটে যেতে পারে। তিনি লোকাল এনেসথেসিয়া দিয়ে নিজের সংক্রমিত এপেনডিক্স নিজেই অপারেশন করে অপসারণ করলেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন আবহাওয়াবিদ তাকে এই অপারেশনে সহযোগিতা করেন।

আত্মকথন ১: ডাক্তারকে পরীক্ষা

ডাঃ যায়নুদ্দীন সানী,৩০তম ব্যাচ,রাজশাহী এমসি,সহকারী অধ্যাপক (রেস্পিরেটরি মেডিসিন),রংপুর এমসি

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের মানব শরীর, রোগ, জীবাণু, ওষুধ এমন অনেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। কিভাবে রোগীর সঙ্গে কথা বলতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে, এসব সম্পর্কে বিস্তর নিয়ম নীতি বেঁধে দেয়া আছে। তবে কিছু ব্যাপার আছে, যা ঠিক বই পত্র ঘেঁটে পাওয়া সম্ভব না। এগুলো নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে আমরা শিখে যাই।
আমরা যেমন রোগী পরীক্ষা করি, রোগীরাও আমাদেরকে করে। প্রথমেই যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তা হচ্ছে, বাইরে ভিড় কেমন। খুব ভিড় নেই, বয়সে তরুণ এমন ডাক্তার দেখানোর জন্য বেশ ভীতিকর। অভিজ্ঞতা নাই, রোগ ধরতে পারবে কি না? এমন ডাক্তারের একমাত্র ভরসা তাঁর ডিগ্রী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তো এখন আবার অনেক শাখা প্রশাখা। তাই রোগী খুঁজতে শুরু করে নিজের সমস্যার জন্য কোন শাখায় গেলে ভালো হয়। এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল করেন।
প্রথম ভুলটা সেরে এবার তিনি এগিয়ে যান দ্বিতীয় ভুলের দিকে। এবার তিনি খানিকটা নাক কুঁচকে শুরু করেন চেম্বার পরিদর্শন। প্রথমেই ঢুকে যেটা লক্ষ্য করে, চেম্বারটা কেমন? সাজানো গোছানো না অগোছালো? যে টেবিলের পেছনে ডাক্তার সাহেব বসে আছেন তা কেমন সাইজের। ছোটখাট টেবিল মানেই 'এর কাছে আর আসা যাবে না'। ঢাউস একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল খুব আকর্ষণীয়। টেবিলের ওপরে কি কি আছে? নিজের বিষয়ের কিছু বই, বিভিন্ন ফার্মা কোম্পানির উপঢৌকন, কলম স্ট্যান্ড, স্লিপ প্যাড, টেবিল ক্যালেন্ডার (দেখতে দামী মনে হলে ভালো হয়)।
এবার শুরু হবে 'ডাক্তার অ্যানালাইসিস'। এক্ষেত্রে প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে কাঁচা পাকা চুল। দশে ছয় এমনিতেই পেয়ে যাবেন। কলপ দিয়ে কাঁচা করা কিন্তু জুলফির কাছে কিছু বাদ দেয়া, নেহাত মন্দ না। সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া, চুল আসলে পেকেছে। বেশী বয়স্ক দের কিছু সুবিধা আছে, তাঁর একটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা। আর দুর্জনেরা উনাদের সম্পর্কে রটনা দেন, 'আপ টু ডেট ইনফরমেশান রাখে না। পুরনো ধাঁচের চিকিৎসা দেন'। তাই অনেকে এখন আবার ল্যাপটপ ধরেছেন। পারুন আর নাই পারুন একটা ল্যাপটপ পাশে খুলে রাখা হয়। ই-মেইল একটা না থাকলে আজকাল জাত নষ্ট হয় দেখে, এখন অনেকেরই আছে।
'ডাক্তার অ্যানালাইসিস' এ আরও অনেক ব্যাপার দেখা হয়। বয়স তাঁর মধ্য একটা। জিজ্ঞেস যেহেতু করা যাচ্ছে না, তাই চেহারা দেখে আন্দাজ করা হয়। চেহারায় 'কচি' ভাব থাকলে, নেগেটিভ মার্ক। সুন্দর চেহারা অবশ্যই কাজে দেয়। একটা চশমা থাকলে বেশ কাজে দেয়, কেমন একটা 'ইন্টেলেকচুয়াল' ফিলিং দেয়। 'ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র তো ছিলই এখনও প্রচুর জানার আগ্রহ'। বেশভূষায় কমপ্লিট বেশ কাজে দেয়। অন্ততঃ সোয়েটার এর চেয়ে অনেক উপকারী। গরমের দিনে একটা টাই।
আমার প্রথম চেম্বার পেতে একটু কষ্ট হয়েছিল। কেবল উচ্চতর ডিগ্রী পাশ করেছি, চেহারায় ও এখন জ্ঞানী ভাব আসেনি, চশমা নেই, চুল কালো। প্রচুর দোষ। হাসপাতাল মালিক আমার এক শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, 'বসতে চায় আমার এখানে, কি করব?' আমার সেই শিক্ষক বদান্যতা দেখালেন। বসবার সুযোগ পেলাম। ভুল হল, বলা উচিত একটা চেম্বারে বসে মাছি মারবার সুযোগ পেলাম।
এ ব্যাপারে আমি আগে থেকেই তৈরি ছিলাম। প্রথম দুই এক বছর লাগবে পরিচিতি তৈরি হতে। তাই কখনও পড়ার বই, কখনও গল্পের বই নিয়ে যেতাম। গল্পের বই লুকিয়ে পড়লে ভালো হয়। কেননা রুগী ঢুকে ডাক্তারকে সাহিত্যপ্রেমী হিসেবে দেখলে মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন। আমাদের মত নতুনরা সাধারণতঃ চেম্বার অ্যাটেন্ডেন্ট পায় না। পাশাপাশি কয়েকটা রুমে তরুণ ডাক্তার থাকলে, সবার জন্য একজন অনেক সময় দেয়া হয়। আমার তেমন একজন ছিল। চেয়ার টেবিল সহযোগে বসে থাকত, কেউ যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে 'বক্ষব্যধি বিশেষজ্ঞ এখানে কেউ বসে?' তখন আমার শিকে ছিঁড়তে পারে।
একদিন আমার সাহিত্য প্রেম চলছিল। এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বইটা রেখেছিলাম টেবিলের ওপরে। এমন সময় আমার চেম্বারের স্লাইডিং ডোর কেউ টানলেন। গল্পের বইটা লুকানোর সুযোগ আর এখন নাই। একজন ভদ্রমহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। 'ডাক্তার সাহেব নাই?'
মিনমিন করে বললাম, আমিই ডাক্তার।
ভদ্র মহিলার শেষ আশার প্রদীপটাও নিভিয়ে দিলাম। উনার করুণ চেহারাটা দেখে যে কারো মায়া লাগবে। এখন তিনি ভয়ানক সমস্যায় পড়েছেন। 'আপনাকে দেখাবো না' বলে চলে যেতেও পারছেন না আবার আমাকে দেখিয়ে ৩০০ টাকা পানিতে ফেলার শোক ও সামলাতে পারছেন না। মধ্য বয়সী একজন রাশভারী চেহারার লোক ছাড়া যে কেউ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হতে পারে, এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তিনি রীতিমত বিভ্রান্ত। উনার নিরাশ চেহারার দিকে তাকিয়ে বললাম, বসুন।
আমাদের দেশে নতুন চিকিৎসকদের, এমনই সব ভয়ানক অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবন শুরু করতে হয়। কখনও সারাদিন বসে অপেক্ষা, কখনও দরজার সামনে কিছু খস খস শব্দ, মনে একরাশ প্রত্যাশা, এই বুঝি দরজা ঠেলে একজন রুগী আসবে। কখনও নামের নিচে ছোট করে লেখা ডিগ্রী কিংবা কি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁর বিবরণ দেখে দুই একজন রুগী আসা। কখনোবা হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সুনাম শুনে।
এরপরে আমাদের দাঁড়াতে হয় অদৃশ্য এক ভর্তি পরীক্ষার সামনে 'ডাক্তার অ্যানালাইসিস'। আমার বেশভূষা, মুখশ্রী (রাশভারী কি না) এবং সর্বোপরি আমার চেম্বারের সৌন্দর্য যদি তাঁকে মুগ্ধ করে তবেই আমি পাশ। আমি রুগীর মনে স্থান পাব। তিনি আমাকে মেনে নিবেন একজন ডাক্তার হিসেবে। এরপর শুরু হবে আমার শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতার পরীক্ষা। 'ডাক্তার হিসেবে আমি কেমন'।

বিজ্ঞান লেখক

এস,এম সাজ্জাদ,১৯তম ব্যাচ,খুলনা এমসি

১। নীলস বোর বোরের পারমাণবিক গঠনের আইডিয়াটা এসেছিল স্বপ্নে। তেমনি বেনজিনের আবিষ্কারক ফেডেরিক কাঁকুলে বেনজিনের আণবিক গঠনের নকশাটা আবিষ্কার করেছিলেন স্বপ্নে। আবার বাম স্ট্রোকারের কথা বলা যেতে পারে। হলিউডের চিত্র পরিচালক একদিন সুটিং সেটেই ঘুমিয়ে পড়ে ছিলেন। স্বপ্ন দেখলেন বাদুড় রূপী ভ্যাম্পায়ার দানবরা পৃথিবী আক্রমণ করেছে। স্নায়ুক্ষয়ী দুঃস্বপ্ন শেষে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন স্ট্রোকার কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন। রচিত হলো কালজয়ী উপন্যাস 'ড্রাকুলার'। তাহলে আমাদের বেশী বেশী স্বপ্ন দেখা দরকার। আর স্বপ্ন দেখতে হলে অবশ্যই গভীর ঘুমের পর্যায়ে যেতে হবে বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে REM(Rapid Eye Movement) SLEEP.

২। মন বলতে সাধারণভাবে বোঝায় যে, বুদ্ধি এবং বিবেকবোধের এক সমষ্টিগত রূপ যা চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, ইচ্ছা এবং কল্পনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আরো সাধারণভাবে বলা যায় যে মন হচ্ছে এমন কিছু যা ব্রেনের অংশবিশেষ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে। কিন্তু বহুকাল আগে থেকেই মানুষ নানা ভাবে জানার চেষ্টা করেছে, কীভাবে মন বা স্বত্তা কাজ করে। এই সম্পর্কে প্লেটো বা তার শিক্ষক সক্রেটিসের ধারণা ছিল, মানুষের অস্তিত্বের মূল উপাদান হল আত্মা বা মন বা soul, যা নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের আচরণ। তার মতে আত্মা অনন্ত, দেহের মৃত্যু হলেও আত্মা অক্ষয়। প্লেটোনীয় আত্মার ছিল তিনটি অংশঃ
১. লোগোস বা মন বা সাধারণ বোধ।
২. থাইমোস বা আবেগ।
৩. ইরোস বা আকাঙ্খা বা ইচ্ছা।
এরিস্টটলের মতামত প্লেটোর মতই ছিল, কিন্তু সে আত্মার দেহভিন্ন কোন আলাদা অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেনি, যা দেহান্তরে ভ্রমন করতে পারে। এরিস্টটলের ধারনা ছিল, আত্মা বা মন হল প্রাণের যথার্থতা। আমরা তো মন নিয়ে প্রাচীন ধারণা পেলাম কিন্তু বিজ্ঞান এসব বলে না। বিজ্ঞানের ভাষায় ব্রেনের নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীকে মন বলে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রেনের সেই কাজগুলো কি, যাকে আমরা মন বলি?

মৃত্যুপুরী থেকে বলছিঃ রানা প্লাজা

মারুফুর রহমান খান,৮ম ব্যাচ,এনাম এমসি

মাইক্রোবায়োলজি লেকচার ক্লাস চলছিলো। হঠাৎ খুব হৈ-হুল্লোড়। নতুন কি? হাসপাতালে এরকম হয়েই থাকে।
ক্লাস শেষ করে নিচে নামলাম। তখন ১০ টা। চারদিকে এতো ভিড় কেন? অ্যাম্বুলেন্সে করে এতো মানুষ আসছে কেন? কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেলো। কি অবস্থা একেকটা রোগীর! তাকানো যায় না! চোখে জল টলমল করা শুরু করে দিল। ঠাহর করতে পারি নি এভাবে স্রোতের মতো অ্যাম্বুলেন্স আসবে। শক্ত হবার চেষ্টা করলাম, আবেগে গলে পড়ার সময় না এখন। ইতোমধ্যে সহপাঠী- সিনিয়র- জুনিয়র অনেকেই কাজে নেমে পড়েছেন। এপ্রন গুটিয়ে শুরু করলাম। প্রায় সব শিক্ষক-ছাত্র- কর্মকর্তা-কর্মচারী ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছেন।

এক অ্যাম্বুলেন্স থেকে রোগী নামাতে না নামাতেই চলে আসে আরেকটা। যারা উপস্থিত সকলে যেন দিশেহারা। এত ট্রলি, এতো হুইল চেয়ার আনা- নেয়ার লোক কোথায়? কর্মচারীদের সাথে হাত লাগালো এখানেও ছাত্ররা,
আশেপাশের মানুষেরা। একেকজনের সর্বাধিক শক্তি দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, কতটা দ্রুততার সাথে যে আনা- নেয়া করছিল,তা কল্পনাতীত। একেকজনের চেহারায় যে কতটা উদ্বেগ, কতটা আতঙ্ক তা বলে বোঝাবার না।

এক সময় রোগীদের সংখ্যার সাথে আর তাল মেলাতে পারছিল না ট্রলি আর হুইল চেয়ারগুলো। এখন এক ট্রলিতেই দু'জন। তবুও পারা যাচ্ছে না। এবার কোলে করে দৌড়ে ভেতরে নিয়ে যাবার পালা। তাই শুধু এখানে- ওখানে রক্ত নয়। অ্যাপ্রনগুলোতেও রক্তের ছোপ ছোপ দাগ; রক্তে মাখামাখি। এক সময় খেয়াল করলাম সদ্য এমআরসিপি করে আসা স্যারের অ্যাপ্রনটা ছিঁড়ে গেছে ইতোমধ্যে।

ইমারজেন্সি রুমে ঢুকলাম। কোন সুস্থ- স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সেখানে খুব বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব না। শুধু ডাক্তার বলেই হয়তোবা তাঁরা সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আছেন। স্যার- ম্যাডামরা, ভাইয়া - আপুরা অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, যাকে বোধহয় বলে সাধ্যের সবটুকু। রোগী আসলেই নাম জিজ্ঞেস করে, প্রাথমিক পরীক্ষাটুকু করে, ব্যবস্থাপত্র লিখতে হয়। কয়েকজনকে নাম জিজ্ঞেস করি, ফ্যালফ্যাল করে এদিক- ওদিক তাকায়, কাঁদে। নাম বলতে পারে না।

শুধু বলে, আমার এ কোথায়, আমার ও কোথায়? এ না হলে মানুষ? নিজে মরে যাচ্ছে, সেটা খেয়াল নেই; প্রিয়জন কোথায় আছে, সেটা আগে জানা দরকার। একসময় ইমারজেন্সি রুমে আর সঙ্কুলান হোল না; এবার চাদর বিছিয়ে নিচে শুইয়ে দেয়া হোল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রোগী এসেই চলছে। সমস্ত ওয়ার্ডগুলো রোগীতে ভরপুর। ফ্লোরে শুইয়ে রাখতে হয়েছে। আর ওদিকে ক্রমশ বাড়ছিলো মৃতের সংখ্যা। তখন রক্ত দরকার, প্রচুর, প্রচুর। একটা টেবিল আর টুল নিয়ে বাইরে বসা হয়েছে। যারা রক্ত দেবে তাদের তালিকা করা হচ্ছে। লিখে কূল পাচ্ছি না। পাশে থাকা আরও দুই লোক আমার সাথে লিখতে থাকলেন।
শত- শত মানুষ রক্ত দিতে চলে এসেছেন, শুধু সাভার থেকে নয়; বহু দূর- দুরান্ত থেকে। কার আগে কে দেবেন, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা। কে নেই রক্ত দেয়ার জন্য? কিশোর- কিশোরী, তরুণ- তরুনী, যুবক- যুবতী, বয়স্ক সকলেই। অনেক হয়ে গেছে। তখন আর রক্তের প্রয়োজন নেই। তবুও মানুষ বলছে, আমারটা নিন, আমারটা নিন, আমি রক্ত দেবো। মানবতা নাকি আর কারও মাঝে নেই এখন? গাজীপুরের এক মাদ্রাসা থেকে ৭০ জন ছাত্র সারিবদ্ধভাবে চলে এসেছেন রক্ত দেবেন বলে। হাজার-হাজার মানুষ ভিড় করেছে হাসপাতালের সামনে। কেউবা রোগীর স্বজন, কেউবা উৎসুক জনতা। সুষ্ঠু চিকিৎসা সেবা যাতে নির্বিঘ্নে দেয়া যায়, তাই ভেতরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছিল না সাধারণ মানুষদের। কিন্তু জনতার আবেগকে কি আর দমিয়ে রাখা যায়? পুলিশ আসলো, আর্মি আসলো। আর হাসপাতালের গার্ডরা তো ছিলেনই, সাথে আরও কয়েকজন স্বপণোদিত স্বেচ্চাসেবক। মানুষগুলো খুব আকুতি- মিনতি করছিল ভেতরে ঢোকবার জন্য।

শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, "I have to be cruel only to be kind." সেটার বাস্তব প্রয়োগ দেখলাম আজ।
কি বলবো আমি!! একজন হুট করে এসে পায়ে ধরে বসলেন, একটু যেন ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিই।
অন্তরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, কিন্ত কিছু করার ছিল না। এরকম অনেকেই অশ্রুসজল চোখে অনেক অনেক অনুরোধ করেছেন। খুব খারাপ লাগছে।

আর ঐ মানুষগুলোর কথা কি বলবো আমি? বলে কি শেষ করা যাবে কখনও? যারা আহত, যারা নিহত, যারা তাদের স্বজন-প্রিয়জন তাদের কথা কি বলবো আমি? যে মা সন্তান হারিয়েছেন, যে সন্তান বাবা-মা হারিয়েছেন, যে স্বামী বধূ হারিয়েছেন; আমার কি ক্ষমতা আছে সেগুলো বলার মতো? রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন, " ভাব যেখানে প্রবল, ভাষা সেখানে দুর্বল।" আজকের দিনে ওখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কারও পক্ষেই সম্ভব না বিস্তারিত বর্ণনা করা। শুধু এতটুকু বলবো, টেলিভিশনের পর্দায় দেখা, আর অ্যাপ্রন গায়ে দেখা, দু'টোর মধ্যে অনেক অনেক তফাৎ।

Life of An Intern: A365 Days Project by Dr. Ayatul Amin, Intern,DMCH

মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক-বাহিনী এবং আলবদর বাহিনীর হাতে নিহত চিকিৎসকগণের নামের তালিকা

১ ডাঃ ফজলে রাব্বী
২ ডাঃ আব্দুল আলীম চৌধুরী
৩ ডাঃ সামসুউদ্দিন আহমেদ
৪ ডাঃ আজহারুল হক
৫ ডাঃ হুমায়ূন কবির
৬ ডাঃ সোলায়মান খান
৭ ডাঃ মিসেস আয়েশা বেদৌরা চৌধুরী
৮ ডাঃ কসির উদ্দিন তালুকদার
৯ ডাঃ মনসুর আলী
১০ ডাঃ গোলাম মর্তুজা
১১ ডাঃ হাফেজ উদ্দিন খান
১২ ডাঃ জাহাংগীর
১৩ ডাঃ এ জব্বার
১৪ ডাঃ শ্যামল কান্তি লালা
১৫ ডাঃ হেম চন্দ্র বসাক
১৬ ডাঃ কাজী ওবায়দুল হক
১৭ ডাঃ নরেন ঘোষ
১৮ ডাঃ আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দিন
১৯ ডাঃ জিকরুল হক
২০ ডাঃ হাসিময় হাজরা
২১ ডাঃ সামছুল হক
২২ ডাঃ মফিজ উদ্দিন খান
২৩ ডাঃ এস রহমান
২৪ ডাঃ অমূল্য চন্দ্র চক্রবর্তী
২৫ ডাঃ এ গফুর
২৬ ডাঃ আতিকুর রহমান
২৭ ডাঃ মনসুর আলী
২৮ ডাঃ গোলাম সরওয়ার
২৯ ডাঃ রমনী দাস
৩০ ডাঃ আর সি দাস

৩১ ডাঃ এস কে সেন
৩২ ডাঃ রবিউল হক
৩৩ ডাঃ এ কে এম গোলাম মোস্তফা
৩৪ ডাঃ মিহির কুমার সেন
৩৫ ডাঃ মকবুল আহমেদ
৩৬ ডাঃ সালেহ আহমেদ
৩৭ ডাঃ এনামুল হক
৩৮ ডাঃ অনিল কুমার সেন
৩৯ ডাঃ মনসুর(কানু)
৪০ ডাঃ সুশীল চন্দ্র শর্মা
৪১ ডাঃ আশরাফ আলী তালুকদার
৪২ ডাঃ কাজল ভদ্র
৪৩ ডাঃ মো বজলুল হক
৪৪ ডাঃ লেঃ এ এফ এম ফারুক
৪৫ ডাঃ লেঃ কঃ জিয়াউর রহমান
৪৬ ডাঃ লেঃ কঃ বদিউল আলম
৪৭ ডাঃ লেঃ কঃ জাহাংগীর
৪৮ ডাঃ লেঃ কঃ সৈয়দ আব্দুল হাই
৪৯ ডাঃ মেজর আসাদুল হক
৫০ ডাঃ মেজর রিয়াজুর রহমান
৫১ ডাঃ মেজর মুজিবুদ্দিন আহমেদ
৫২ ডাঃ মেজর নাইমুল ইসলাম
৫৩ ডাঃ লেঃ নুরুল ইসলাম
৫৪ ডাঃ লেঃ এনামুল হক
৫৫ ডাঃ মনসুর রহমান
৫৬ ডাঃ গোপাল চন্দ্র সাহা
৫৭ ডাঃ নরেন্দ্র নাথ দত্ত
৫৮ ডাঃ এ বি এম নুরুল আলম
৫৯ ডাঃ এ মুক্তাদির
৬০ ডাঃ রেবতী কান্ত সান্যাল
৬১ ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র দে
৬২ ডাঃ এ রহমান
৬৩ ডাঃ নওসের আলী
৬৪ ডাঃ সাইদ মোহিত ইমাম
৬৫ ডাঃ মেজর আমিনুল ইসলাম
৬৬ ডাঃ লেঃ কঃ বি এ চৌধুরী
৬৭ ডাঃ লেঃ কঃ আমিনুল হক
৬৮ ডাঃ লেঃ খন্দকার নুরুল ইসলাম
৬৯ ডাঃ রফিক আহমেদ
৭০ ডাঃ অমলেন্দু দাক্ষী
৭১ ডাঃ আব্দুন নূ
৭২ ডা আব্দুল মান্নান মোল্লা
৭৩ ডা কোরবান আলী
৭৪ ডা দিগেন্দ্র চন্দ্র এন্দ
৭৫ ডা নিশি হরি নাগ
৭৬ ডা ম আলমগীর মিঞা
৭৭ ডা মনোরঞ্জন জোয়ার্দার
৭৮ ডা মতিয়ুর রহমান
৭৯ ডা শফী
৮০ ডা ম শাখাওয়াৎ হোসেন
৮১ ডা ম শামসাদ
৮২ ডা মাহতাব উদ্দিন আহমেদ
৮৩ ডা মোজাম্মেল হক
৮৪ ডা শাহ আব্দুল আজিজ
৮৫ ডা শাহ আমিন হোসেন
৮৬ ডা সুজাউদ্দীন আহমেদ
৮৭ ডা হাসিবুর রহমান
৮৮ ডা হেমন্ত
(প্ল্যাটফর্ম পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ একজন চিকিৎসকের জীবন কথা প্রকাশিত হবে।)

শিক্ষকদের পাতা

ব্যাকরণ বিভ্রাট

আবু সাদাত মোঃ নুরুন্নবী,
এমফিল (এনাটমি), এমএসসি (বায়োইথিক্স) সহকারী অধ্যাপক (এনাটমি) ওএসডি এবং রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর বায়োমেডিকেল ইথিক্স এন্ড ল, ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয় লুভেন, বেলজিয়াম

কতদিন পরে এই লাইব্রেরিতে বসে পড়ছি। পড়তে পড়তে শীতের উদাস হাওয়া গায়ে এসে লাগে। পুরনো স্মৃতি করোটিতে হানা দেয়।
ব্যাকরণের প্রতি আমার সীমাহীন দুর্বলতা। ব্যাকরণ ভাষা শিক্ষার চাবিকাঠি। বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার পড়াতেন এমন শিক্ষকদের প্রতিও এক ধরণের টান অনুভব করতাম। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা অনেকাংশেই ব্যাকরণভীতিতে আক্রান্ত থাকত। আমার মন চাইত বড় হয়ে ব্যাকরণের শিক্ষক হব। একজন কড়া প্রকৃতির ব্যাকরণ শিক্ষককে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করাতে তিনি বললেন, "আমি ব্যাকরণ ভাল পড়াই এটা ছাত্ররা জানে, কিন্তু কেন জানি আমাকে আর আমার পড়া ধরাটাকে খুব ভয় পায়?" আমি বললাম, "পড়াটাও একটু রসহীন, আর আপনিও নির্দয়ভাবে পেটান।" উনি মৃদু হেসে আমাকে বললেন, "তা ঠিক, কিন্তু ব্যাকরণ নীরস নয়। একটা গল্প শোন। একদিন ক্লাসের মোটামুটি মাথা ভাল এরকম এক ছেলেকে 'কুলি' লিঙ্গ পরিবর্তন করতে বললাম। সে অনেক্ষণ চিন্তা করে 'কুলিনা', 'কুলিনী', 'কুলিনীতা' এসব বলে আমার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল। তারপরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, "স্যার, রাত জেগে সত্যি সত্যি ব্যাকরণ পড়েছি। 'লিঙ্গ' খুলে পড়ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে গেছি মনে নেই, সকালে উঠে দেখি 'ধাতু' বের হয়ে আছে! আমাকে মারবেন না।"-বলেই উনি আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠিক করলাম ব্যাকরণের শিক্ষকতা করবনা।
ওপরওয়ালা বোধহয় মুচকি হাসলেন। আমি এখন চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাকরণ পড়াই। আমাকেও লিঙ্গ এবং ধাতু পড়াতে হয়!!!
পুনশ্চঃ এনাটমি এবং ফিজিওলজিকে আমি চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাকরণ বলে মানি।

যা পাই তা চাই না...

ইমতিয়াজ আহমেদ , রামেক , ৩১তম ব্যাচ, সহযোগী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ , স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ।

নব্বই দশকের শেষের দিকে কর্মজীবন শুরু করি উত্তরার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগের প্রভাষক পদে। দুই বছরের কিছু বেশি সময়ের আমার জীবনের সেই প্রথম দিকের কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই ডিপার্টমেন্টে আমাদের সাথে দেখা করতে আসতেন শিক্ষার্থীদের অনেক অভিভাবক। জানতে চাইতেন সন্তানের একাডেমিক অবস্থা। সম্ভবত বেসরকারী মেডিকেল কলেজে সন্তান ভর্তি বাবদ ব্যয় করা উচ্চ অর্থ মূল্য অভিভাবকদের তাড়িত করতো সন্তানের লেখাপড়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার জন্য।

বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের জন্য ছেড়ে আসতে হয় আগের বেসরকারী কর্মক্ষেত্র। ইউনিয়ন আর উপজেলা পর্যায়ের চাকুরী জীবন, উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বেশ কয়েক বছর হল থিতু হয়েছি আবার মেডিকেল কলেজের শিক্ষকতা পেশায়। আমার বর্তমান কর্মস্থল রাজধানীর একটি সরকারি মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ।

এখানে অভিভাবকেরা আসেন না বললেই চলে। কোন শিক্ষার্থী বেশি সমস্যায় পড়লে (যেমন পেশাগত পরীক্ষায় ফর্ম ফিলাপে অযোগ্যতা, বারবার অকৃতকার্য হওয়া প্রভৃতি) যে অভিভাবকেরা আমাদের কাছে আসেন তারা মূলত চিকিৎসক পেশার অভিভাবক। তারা সম্ভবত আমাদের সাথে দেখা করতে কিছুটা সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। গতকাল এলেন একজন অচিকিৎসক অভিভাবক। তিনি দেখা করতে এসেছিলেন বিভাগীয় প্রধানের অর্থাৎ অধ্যাপকের সাথে, যিনি একই সাথে ছাত্রী হলের তত্ত্বাবধায়ক। সেই সময় প্রধান অধ্যাপক বিভাগে না থাকায়, বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক সেই অভিভাবককে রেফার করেন আমার কাছে। কারণটি মনে হয়, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে আমি বিডিএস কোর্সের দেখভালের দায়িত্বে আছি।

আমি সম্মানিত অভিভাবকের পরিচয় জানতে চাইলাম। তিনি দূরের জেলার এক উপজেলা পর্যায়ের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত শিক্ষক। দূর থেকে রাজধানীতে এসেছেন, সেদিন'ই চলে যেতে হবে। একজন বয়স্ক আর দরিদ্র মানুষ। চেহারা আর পোশাকে কঠোর জীবন সংগ্রামের ছাপ। সেই সংগে কিছুটা বিধ্বস্ত আর বিমর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেকে সাথে করে নিয়ে এসেছেন তিনি।

তার সমস্যা জানতে চাইলে বললেন, তার কন্যা সন্তান আমাদের মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে, ডেন্টাল ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ছাত্রী হোস্টেলের কমন রুমে সিটও পেয়েছে।

হোস্টেলের কতিপয় ছাত্রী নাকি মন্তব্য করেছে যে, বিডিএস ভাল কোন কোর্স না, এই কোর্সে কষ্ট করে পড়ে কোন ভবিষ্যৎ নাই ইত্যাদি। এরই মধ্যে এই ধরনের নেতিবাচক কান কথা শুনে, প্ররোচিত হয়ে, ডেন্টালের প্রথম বর্ষের সদ্য ভর্তি হওয়া তার দুইজন সহপাঠিনী নাকি কলেজ থেকে চলে গেছে আর বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অথবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

এই শিক্ষকের মেয়ে এখন জেদ ধরেছে যে, এই বিষয়ে সে কোনমতেই পড়বে না। তাকে অন্য কোথাও ভর্তি করে দিতে হবে। অথচ বেসরকারিতে পড়ানোর সামর্থ্য এই শিক্ষকের নেই । মেয়ে ইতিমধ্যেই হোস্টেল থেকে বাড়ি চলে গেছে। শুধু তাই নয় , মনঃচিকিৎসকের পরামর্শে তাকে উচ্চ মাত্রার ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

ভদ্রলোকের অসহায় বিপন্ন চেহারা দেখে খুব খারাপ লাগলো। এই ১৮-১৯ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েরা খুব আবেগপ্রবণ হয়। জীবনকে তারা দেখে রঙ্গিন চশমা দিয়ে। জীবনের কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে ধারনা খুব কমই তাদের থাকে।

দেশে আর দেশের বাইরে বিডিএস খুবই দামী একটি কোর্স ।আর সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রায় নিখরচায় পড়ার সুযোগ পাওয়া অনেকটা সোনার হরিন পাওয়া। বিডিএস কোর্স শেষ করার পরে আমাদের দেশেই আছে বিসিপিএস আর বিএসএমএমইউ থেকে ডেন্টাল রিলেটেড বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে (যেমন ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী, অরথডন্টিক্স ইত্যাদি) এফসিপিএস, এমএস জাতীয় ডিগ্রী নেয়ার সুযোগ। গতানুগতিক দাঁত তোলা, রুট ক্যানেল আর স্কেলিং-এর বাইরে রয়েছে বহু হাই প্রফাইলের এবং উচ্চ প্রযুক্তির শল্য চিকিৎসার সুযোগ। আমাদের মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে রয়েছেন আমার পরিচিত লেকচারার পদমর্যাদার একজন তরুণ শিক্ষক যিনি ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারীতে এফসিপিএস এবং এম এস ডিগ্রি ধারী। এছাড়া রয়েছে ডিপ্লোমা আর পিএইচডি করার সুযোগ। আমাদের দেশের বহু ডেন্টাল সার্জন দেশে আর দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত সার্জন হিসাবে কর্মরত আছেন এবং দেশের সুনাম বাড়াচ্ছেন । আজ যাদের নেতিবাচক মন্তব্য এবং কথা উচ্চ শিক্ষা জীবন শুরুর প্রারম্ভে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ মেয়েটিকে বিভ্রান্ত করল, তার কচি মনটিকে বিষিয়ে তুলল , জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার সময় তারা হয়তো তার কোনভাবেই কোন উপকার করবে না। তার কোনো খোঁজও নিবে না।

নিজের কঠিন জীবন সংগ্রাম নিজেকেই করতে হয়। আর চিকিৎসা পেশার প্রাথমিক কর্মজীবনে সাফল্যের শীর্ষে উঠার, শীর্ষ পদে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ, আমার অন্তত জানা নেই। কষ্টকর, ঘাম ঝরানো, আর অনেক প্রলম্বিত ধাপ অতিক্রম করার পর পৌঁছানো যায় শীর্ষ পদে আর প্রতিষ্ঠিত জীবনে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার সন্তানতুল্য এই মেয়েটিকে সুমতি দেন, সে যেন সব পিছুটান পিছনে ফেলে আবার আমাদের এই পরম গর্বের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নের চত্বরে ফিরে আসে। কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের বিনিময়ে দন্ত চিকিৎসক সমাজের উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় আর অভিভাবকদের মুখ উজ্জ্বল করে।

আপনার...

ডাঃ সানজিদা শাহরিয়া, এমফিল (এনাটমি) ডিপ্লোমা ইন কাউন্সেলিং এন্ড নিউরোলিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রাম, সহযোগী অধ্যাপক, জেড এইচ শিকদার এমসি

এমবিবিএস পরীক্ষা নিতে গেছি। এনাটমি ভাইভা। মানুষের শরিরের অংগ প্রত্যঙ্গ, হাড় হাড্ডি কোথায় কি আছে, খালি চোখে বা অনুবীক্ষণের নিচে জানা'ই এনাটমি। কঠিন পরিক্ষা। রিটেন, ভাইভা, প্রাক্টিকাল বহু ভাগ একাধিক দিন ধরে চলে। ছাত্রছাত্রীদের বেড়াছেড়া লেগে যায়। ইন্টার্নাল অসুস্থ থাকায় আমারা ২ জনই এক্সটারনাল সফট পার্ট বোর্ডে বসেছি। শফিক ভাই আমাদের মেডিকেল এর সিনিয়ার ভাই ছিলেন। সেই সময় থেকে ভাল খাতির। একসাথে সন্ধানী করতাম। তাই ২ জন এক সাথেই বসলাম পরিক্ষা নিতে।
ভাইভা শুরু হল। এক এক জন আসছে যাচ্ছে। আমরা শুরুতেই বলেছি যেহেতু ইন্টার্নাল হঠাৎ অসুস্থ তাই ছাত্রছাত্রীরা যেন আমাদের ২ অপরিচিত একজামিনারকে ভয় না পায়।
বিশাল বড় ডিসেকশন হল। এক প্রান্তে নানা ভিসেরা নিয়ে আমরা টেবিলে বসেছি। অন্য দিকে ডিসেকশন টেবিলে ২ টা ডেড বডি, কঙ্কাল, এক্সরে। মাঝামাঝি সময় পার হয়েছে। ভালই ভাইভা দিচ্ছে ছেলে মেয়েরা। শাফিক ভাই একটু ওয়াশরুমে গেলেন।
এক ছেলে ঢুকলো।
'স্লামালেকুম ম্যডাম' টেবিলের ধারে এসে দাঁড়লো।
'ওয়ালাইকুম সালাম। বসো।'
কাচুমাচু ভঙ্গিতে বসল। ভয় পাচ্ছে বুঝলাম। সহজ করার জন্য বললাম, 'তোমার নাম কি?'
'আপনার আবুল কালাম আজাদ।'
'দেশ কোথায়?'
'আপনার গ্রামে। ময়মনসিংহ
'একটা কার্ড তোলো। 'বলাতে ছেলেটি কাঁপাকাঁপা হাতে তুলল। আমার হাতে দিল।
কার্ডে দেখি ভিসেরা হার্ট এসেছে প্রথমে।
বলাম, 'হার্টটা নাও এনাটমিকাল পোজিশন বল'।
'this is আপনার heart, apex in directed downward forward & আপনার laterally...'
"Tell me the parts of heart"
"আপনার heart has apex & base, আপনার ৩ borders... ইত্যাদি ইত্যাদি।"
বুঝলাম, আপনার বলাটা তার মুদ্রাদোষ। যাই হোক আমার heart, আমার লিভার, আমার কিডনির gross anatomy, histology, embryology, clinical anatomy সব শুনলাম। ছেলেটা ভালই পড়েছে। বাকি ভিসেরা আছে শুধু prostate আর brain।এমন সময় দেখি শফিক ভাই হেলতে দুলতে principal এর সাথে কথা বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রিন্সিপাল স্যার আমাদেরও শিক্ষক ছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম। কুশলাদি বিনিময়ের পর স্যারও বসলেন, বললেন, 'কেমন বলছে ছেলে মেয়েরা?
'ভাল স্যার' আমি হাসি মুখে বললেন। হঠাৎ মাথায় দুস্টু বুদ্ধি চাপলো। শফিক ভাই কে বললাম, 'ভাইয়া আপনি ধরেন আমি ৩ টা ভিসেরা ধরেছি, ভাল বলেছে।'
শফিক ভাই বরাবর দেখেছি স্যারদের লাগুক না লাগুক একটু তেল দিয়ে চলেন। যদিও তিনি মাটির মানুষ। গদগদ মুখে তিনি স্যারের দিকে কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্যার আপনি থাকতে আমি কিভাবে শুরু করি প্লিজ স্যার আপনি শুরু করুন।'
স্যারও দেখলাম হাসিহাসি মুখে কার্ডটা তুলে নিলেন।
বললেন,' ৩ টা ভিসেরা হয়ে গেছে"
আমি আড়চোখে দেখলাম এরপর ভিসেরা আছে prostate.
স্যার দরাজ গলায় লাঠি দিয়ে ট্রে-তে রাখা ভিসেরায় একটা গুঁতা মেরে বললেন, 'বলো এটা কি?'
ছেলেটা উত্তর দিল, 'স্যার, আপনার prostate স্যার!'

গল্প

একটা মেয়ে আর একটা বাঁদরের গল্প.

আব্দুল্লাহ ওমর নাসিফ, জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বাজিতপুর

তুমি বরাবর'ই একটু গোছানো,পরীক্ষার হলে পরিপাটি,কনফিডেন্ট, পানির বোতলটাও তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে কখনও ভুলতে না। আর আমি,নিকোটিন আর ক্যাফেইনের ওভারডোজে, রুমমেটের ধার করা এপ্রোনে, পকেটে একটা কলম গুঁজে, কোন রকমে কাঁচুমাচু মুখে, স্যারের সামনে এসে বসতাম।
পাশাপাশি দাঁড়ালে যদিও ভয়াবহ রকম বেমানান লাগে আমাদের, তারপরও প্রায়ই নিউমার্কেটে ফুচকার দোকানে, অথবা শহীদমিনারের সিঁড়িতে আমাদের একসাথে বসে থাকতে দেখা যেত। অতঃপর, প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে-ডাঃ অমুক, ডাঃ তমুক'কে.. তিনবার কবুল বলিলো।
সর্বনাসের শুরুটা ওখানেই। এখন পায় প্রতিদিনই, "হয় সিগারেট ছাড়বা অথবা আমাকে ছাড়বা" জাতীয়, বাণী হজম করতে হয়। ফুটপাতে বসে চা খেলেও সমস্যা।

নিয়ম করে, এখন আমার মাথায় উৎকট গন্ধযুক্ত, নারকেল তেল আর ডিম মাখানো হয়।
আর রিকশাওয়ালাকে দু'টাকা বেশি দেবার জন্য, কানের কাছে তোমার রোজরোজ ঘ্যানঘ্যান।
আর শুক্রবার সকালবেলা, বাজারে এতো তাড়াতাড়ি না গেলেও চলে কিন্তু। বিনা কারণে আমার ঘুমটা মাটি।
সকালে নাস্তা না করে বাড়ি থেকে বের হবার স্বাধীনতাটুকুও তুমি কেড়ে নেবে।
হাঁটুর কাছে ছেঁড়া, ময়লা আর তালি মারা জিন্সগুলো তুমি হাড়ি-পাতিলওলাকে দিয়ে দেবে।
আমার কমদামী স্যান্ডেল, ব্রেসলেটগুলো, পেতলের বালাটা, গৌতম বুদ্ধের লকেটটা, ওম্ লেখা টিশার্ট তুমি গুম করে দিয়েছো। ওগুলোতে নাকি চ্যাংড়া চ্যাংড়া লাগে। ওগুলোতে নাকি নামাজ হয় না।
বেশি করে জর্দা আর কাঁচা সুপারি দিয়ে, আর কখনই পান খাওয়া হবে না আমার।
আর কখনও তুমি আরেকটা বোম্বাই মরিচ দিয়ে, বেশি ঝাল ঝাল করে মুড়ি মাখা খেতে দিবে না।
স্কুলের বন্ধুদের আড্ডায় তোমার বারবার মিস্‌ডকল, মেসেজ। "হুহ,আমাকে ভুলে গ্যাছো, ভাল্লাগেনা না!!"
কোন জুনিয়র মেয়ে আমাকে হাই বললে তোমার অগ্নিদৃষ্টি। আচ্ছা আমার কি দোষ??? তোমাকেও'ত কতোজন 'হাই বলে। আমার গা জ্বলে যায়।
আমার ঘরটা, বুকশেলফটা,গাড় নীল রঙের দেয়ালগুলো তোমার হাতে বেদখল হয়ে গেছে। এখন দেয়ালের রং উদ্ভট গোলাপী।
প্রতিদিন সকাল বিকাল ডিউটিতে যাবার পথে তোমাকে, তোমার ফাইভ স্টার ক্লিনিকে লিফট। কেন বাবা!! একই হসপিটালে দুজন জব নেয়া যেত না?!! ওহ! তোমারতো আবার আলাদা ফিল্ডে স্পেশালাইজেশন।
দেখো, আমারও কিছু বলার থাকতে পারে। আর পারি না, এভাবে চলতে পারে না। এভাবে আমাকে না বাঁধলেও চলতো। এতো ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না। তোমার মেয়েলি নখরাগুলো আমার সহ্য হয় না। ডাক্তার হবার পরও, তোমার মেয়েলিপনা বিন্দুমাত্র কমলো না। আমার সবকিছুতেই তোমার সমস্যা। আমার সিম্পল লাইফটাকে নরক বানায় ফেলসো তুমি মেয়ে।
তারপর,গভীর রাতে, তুমি আমার পাশে চুপচাপ বসে আছো, হঠাৎ তুমি, "তোমার দিনটা আজ কেমন গেলো?" "খুব খাটনি গেছে না?" "পেশেন্ট বেশি খারাপ ছিলো?" "অনেক চাপ??" নাহ, তেমন একটা না, তোমার ওখানে?
আমার ঘাড়ে তোমার মাথাটা আলতো করে.... তোমার চুলে ঘোর অমাবস্যা.. চোখে রহস্য, হাতে হাত, নিঃশব্দ কিছু কথোপকথন। তারপর বলদের মতো, আমি তোমার কানে কানে..."অ্যাই মেয়ে, শোন, আমি তোমাকে ভালোবাসি"

চোরা কাঁটা

ডাঃ সেলিম শাহেদ,৩০তম ব্যাচ,শেরে বাংলা এমসি(বরিশাল),আইএমও মেডিসিন,স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

১. খেক্ক! খেক্ক করে ভুড়ি কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে 'দি নিউ মডার্ন ক্লিনিকে' প্রবেশ করে 'ডাক্তার (?)' সাবু! রিসিপশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লিনিকের ম্যানেজার 'রতন' 'সাবু ডাক্তার'কে দেখে লাফাতে থাকে কলা পাওয়া বানরের মতো।
'জুতা লইয়াই ঢুকেন, -রতনের স্খলিত আবদার !
'কি কও রতন, জুতা লইয়া ক্যাম্নে ঢুহি? -বলে সাবুডাক্তার আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না ! জুতা নিয়েই প্রবেশ করে !
পয়মন্ত 'কোয়াক' সাবুডাক্তার যাতে কোন ভাবেই ফস্কে না যায় সেই ধ্যানেই আছে ম্যানেজার রতন! রতন জানে সাবুর শুচিবায়ু দোষ আছে !
২. সাবু ডাক্তারকে অনুসরন করে ঢুকে ওয়ান বাই ওয়ান হাফিজ,হাফিজের শ্যালিকা তহুরা, হাফিজের মা জাহেদা বেগম সাথে পোয়াতি বউ চালতা বেগম! যেন ছোট্ট একটা পিপীলিকার লাইন...
শ্যালিকার হাতে একটা বালতি আর একটা মগ! বিছানার চাদর সমেত একটা পোটলা হাফিজের হাতে! জাহেদা বেগমের হাত ধরে ব্যাথায় কোঁকাতে কোঁকাতে বেগুনের মতো বাঁকা হয়ে থাকা অল্প বয়সী চালতা বেগম প্রবেশ করে সবার পরে!
এবং সবাইকে জুতা খুলেই প্রবেশ করতে হয়! এমন কি সকালে ডিউটিতে এসেছেন যে ডিউটি ডক্টর সাদিক, তাঁকেও জুতা খুলে প্রবেশ করতে হয়েছে হাসপাতালে! .....শুধু সাবু ই ব্যতিক্রম!
৩. ডিউটি ডক্টর সাদিক চব্বিশ ঘন্টার খেপে এসেছে! এই খেপ টা আসলে ওর মেডিক্যালের বড় ভাই নিয়নের! ওনার এক বছরের ছেলেটা পাতলা পায়খানা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি! এতেই কপাল খুলে সাদিকের! টানা চার দিনের এই খেপ টা পায় সাদিক! সাদিকের ইন্টার্নশীপ শেষ হলো দুমাস! এক মাস বাসায়ই ছিলো! শাহাবাগের আজিজে উঠেছে গত মাসে! উঠেছে মানে একটা সিট ভাড়া নিয়েছে! এক ফ্ল্যাটে ওরা দশজন! ওদের রুমে ওরা চারজন ! একজন ব্যাঙ্কে চাকুরী করে ! বাকী তিন জন ডাক্তার! কাউকেই আগে চিনতো না সাদিক! নিয়ন ভাই মেডিক্যাল ছাড়ার আগে সাদিককে বলেছিল, 'ঢাকা এলে যোগাযোগ করো'!
সেই যোগাযোগের ফল আজকের 'খেপ'! চারদিনের! টানা চারদিন নিউমডার্ন ক্লিনিকের ডিউটি ডাক্তার সাদিক! নিয়ন ভাইয়ের বাচ্চাটা সুস্থ না হলে আগামী সপ্তাহেও জুটতে পারে আরো চারদিনের খেপ ! টাকাটা ওর ভীষন দরকার!
'ছি! ছি! কি ভয়ংকর চিন্তা করছি আমি.....নিয়ন ভাইয়ের বাচ্চাটা সুস্থ না হলে।
'আল্লাহ নিয়ন ভাইয়ের ছেলেকে সুস্থ করে দাও' মাথায় চাগাড় দেয়া পাপ চিন্তাটার একটা ব্যালেন্স চাইছে সাদিক! টেবিলের উপর পড়ে থাকা 'লিটারেচারটার' উপর খানিকটা বিরক্ত হয়ে একের পর এক সিগনেচার করে চলছে সাদিক!
পুরোটাই কোন কারন ছাড়া! দুপুরের এ সময়টাতে রোগী আসেনা বললেই চলে!
কোলাহল শুনে সম্বিত ফিরে পায় ও! 'স্যার ডেলিভারির রোগী আইছে' ওয়ার্ডবয় মিজান পর্দার ওপার থেকে ডাকতে ডাকতে ওর রুমে প্রবেশ করে! 'আসছি' বলে উঠে দাঁড়ায় সাদিক!
৪. সাবু ডাক্তার চালতা বেগম এবং তার গং কে উপরে চালান করে দিয়ে ম্যানেজারের রুমে এসে বসে!
রোজার দিন না হলে এতক্ষনে টেবিলে থাকতো কালামের দোকানের চাপ, রমিজের দোকানের 'জামাই-বউ' চানাচুর আর মিষ্টি খিলিপান! সাথে ফস পানি-মানে সেভেন আপ!
রিসিপশনিস্ট ববিতা থপ্ থপ্ করে হাঁটতে হাঁটতে হাতে একটা খাম নিয়ে প্রবেশ করে ম্যানেজারের রুমে! ববিতা জানে এই খামে কত টাকা আছে! কারন ও ই গুনে খামের ভেতর রেখেছে! ছোঁ মেরে হাত থেকে নিয়ে নেয় সাবু ডাক্তার! হাসে ক্রু'র হাসি!
'কিরে তর বিয়া কবে! তর বিয়াতে আমি তরে একটা রংগিল টিভি দেয়াম কইলাম'সাবু ডাক্তার রস করে ববিতার সাথে! 'মনে থাকে জ্যান'- খানিকটা লজ্জা পেয়ে বের হয়ে আসে ববিতা!
হাজার টাকার নোট গুলো বের করে হাতে খানিক টা'ছেপ' দিয়ে গুনতে শুরু করে সাবু ডাক্তার! এলাকার 'কোয়াক দ্যা গ্রেট'!
'আপ্নেরে কম দেয়াম,আমার মাথা নস্ট অইছে নাকি?'-ম্যানেজার রতন আশ্বস্ত করে লোভী সাবু কে...
৫. সাদিক ডেলিভারী রুমে প্রবেশ করে ! সিস্টার 'রত্না' সাদিককে বলে 'স্যার, এইডার সিজার লাগবো 'ম্যাডাম' রাস্তায়, সাথে অজ্ঞান ছার ও আছে! আপ্নে ওয়াশ লন!'
সাদিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়! এতদিনের স্বপ্নের বেলুনে কে যেন একটা সূচ ঢুকিয়ে দেয়! আকাশ ছোঁয়া বেলুনটা প্রসব বেদনায় কাতর 'চালতা বেগমের' হাঁটু ভাজ করা পেটটার চুপসে পড়ে থাকে!
৬. টানা চারদিন ডিউটি শেষ করে কাঁধে কালো ব্যাগটাকে সাথে করে হাঁটছে সাদিক! কেমন অমল আকাশ! চারটা দিন চোখের বাইরে ছিলো!
...পকেট থেকে খামটা বের করে সাদিক! এই কয়টা টাকা দিয়ে কেমন করে মেটাবে বোনের আবদার আর মায়ের প্রয়োজনীয়তা? আর হাঁ করে থাকা পুরো মাসটাকেই বা কেমন করে সামলাবে? ভাবতে ভাবতে প্যান্টের চোখ পড়ে ওর! এই চোরা কাঁটা গুলো আসলো কোথা থেকে।

এবারের বই মেলায় (২০১৪) প্ল্যাটফর্মিয়ানদের প্রকাশিত বইয়ের প্রচ্ছদ:

ইশরাত জাহান মৌরী, ১৪তম ব্যাচ, ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ

আমাদের এই ১২০০৩ মেম্বারদের মধ্যে এক জন মেম্বার মানে একজন ভবিষ্যৎ ডাক্তারকে চিনি যিনি হলেন একই সাথে ডাক্তার , কবি এবং গায়ক... তিনি দারুন কবিতা লেখেন আর গীটার ও বাজান... সব JIMCআনদের পরিচিত ... এই বছর বইমেলায় তার একটা বই ও বের হয়েছিল... বইটির নাম" শব্দগুলো জ্যমিতিক"... আচ্ছা এবার তার নাম টা বলেই ফেলি... সে হল Shiblee Shahed....
আমার মনে হয় এরকম আরও অনেক গুণী মানুষ আমাদের মধ্যে আছেন, যাকে বলে ইংরিজিতে ALL ROUNDER.... আমরা বাকি সবার সেই গুনগুলো জানতে চাই আর inspire হতে চাই...

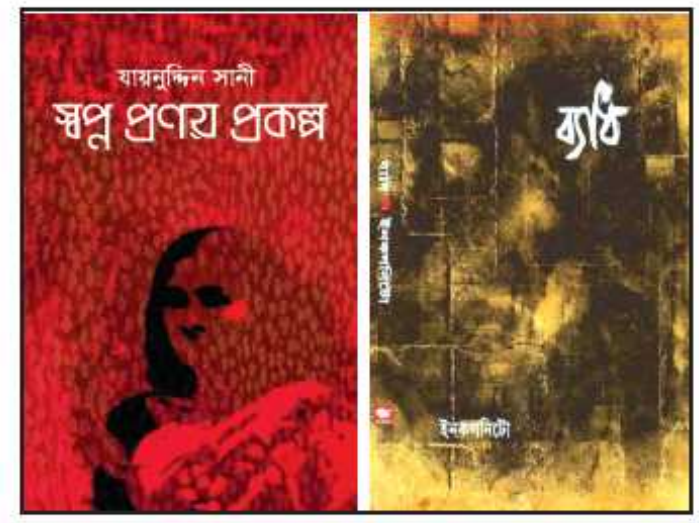

Our Campus Through Our Lens

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৯৯২ ইং)
ছবিঃ মোঃ জহুরুল ইসলাম বনিন, ২০তম ব্যাচ, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ

নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ (প্রতিষ্ঠা ২০০৮ ইং)
ছবিঃ তৌহিদুল হক মাহফুজ, ২য় ব্যাচ, নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ

সিলেট এম এ জি ওসমানি মেডিকেল কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৯৬২ ইং)
ছবিঃ ডাঃ নাকিব শাহ আলম,৪০তম ব্যাচ, সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি।

লিঙ্কঃ
প্ল্যাটফর্ম-www.platform-med.org
লেকচারের লিঙ্ক
প্যাথোলজি Rabiul Haque Rajib
http://www.youtube.com/user/DrRabiulHaque
মাইক্রোবায়োলজি Mahmudul Hoque Jesi
http://www.youtube.com/user/mhmudjesi
মেডিসিন Ahmad Zainuddin Sani http://w
w.erespiratorymedicine.com/respiratorymedicin
e/

http://medicalppt.blogspot.com/
http://medicalbooksfree.com/

যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে
রংপুরে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল

HEALTH CITY

CONCERN OF :

RANGPUR GROUP

- Doctors Community Hospital (Pvt.) Ltd
- RP pharmaceuticals Ltd.
- Rangpur Community Medical College
- RANGPUR HOUSING LIMITED
- Rangpur Dental College
- Rangpur Ready Mix Concrete Ltd.
- Rangpur Community Nursing Institute
- NU AUTO BRICKS LIMITED
- LASER DENTAL CARE & IMPLANT CENTER
- RANGPUR BEVERAGE LIMITED

Corporate Office :
House # 7 (1st Floor), Road # 13 (New) ,Dhanmondi R/A, Dhaka- 1209
Phone: 88-02-8150304,8150279,Fax: 88-02-9140248
Mobile : 01715 201 980, 01732 711 107, 01972 000 200
E-mail: rangpurgroup@ymail.com, www.rangpurgroup.com

Rangpur Office :
Medical East Gate, Dhap, Burirhat Road, Rangpur, Bangladesh.
Phone: 88-0521-61113-5, Fax: 88-0521-61114
Mobile : 01717 292 458, 01773 793 330, 01739 015 195
E-mail: inforcmc@gmail.com,www.rangpurgroup.com